আমি নারী
আমি মুক্তিযোদ্ধা
সম্পাদনা : সেলিনা হোসেন

ভূমিকা

বাঙালি জাতির সর্বকালের শ্রেষ্ঠ গৌরব একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ। ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্ত এবং আড়াই লক্ষ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের মহান স্বাধীনতা। সুদীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এদেশের বীর যোদ্ধারা ছিনিয়ে এনেছে আমাদের স্বপ্নের স্বাধীনতা। যে স্বপ্ন ও আদর্শ নিয়ে আমরা স্বাধীনতার জন্য জীবনপণ করে যুদ্ধ করেছিলাম, সে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয় নি। দিনে দিনে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী অপশক্তিসমূহ সক্রিয় হয়ে উঠেছে এবং মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনাকে নস্যাৎ করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। বিকৃত হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস। তাদের প্রভাব ও আগ্রাসন থেকে নতুন প্রজন্মকে রক্ষা করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শে উজ্জীবিত করতে না পারলে পূর্বপুরুষদের ত্যাগ ও সংগ্রামের সঠিক মূল্যায়ন এবং মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনাভিত্তিক সমাজ গঠনে কার্যকর ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে না। মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস জানতে হলে জানা দরকার মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ যে প্রকৃত অর্থেই ছিল জনযুদ্ধ, সেই সত্য সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে বারবার আঘাত আসবে, ছোবল আসবে।
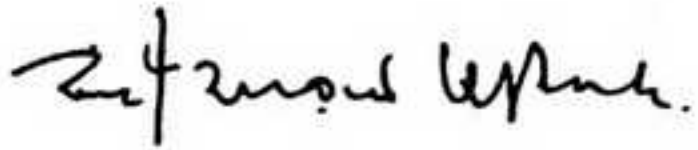
প্রশিকার মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সেলের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ২৬ মার্চ, ২০০৩-এ ৩৯জন নারী মুক্তিযোদ্ধাকে জাতীয় পর্যায়ে সংবর্ধনা দেয়া হয়েছিল। একই আদলে আসন্ন স্বাধীনতা দিবস ২০০৪ উপলক্ষে ১২জন নারী মুক্তিযোদ্ধাকে সংবর্ধনা দেয়া হবে। এই ৫১জন নারী মুক্তিযোদ্ধার জীবনভিত্তিক প্রোফাইল নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে— 'আমি নারী : আমি মুক্তিযোদ্ধা' শীর্ষক একটি বই। স্বাধীনতা দিবসে নারী মুক্তিযোদ্ধাদের বিশেষ সম্মান প্রদানের লক্ষ্যে 'আমি নারী : আমি মুক্তিযোদ্ধা' শীর্ষক যে বই প্রকাশিত হতে যাচ্ছে, তা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে একটি গ্রহণযোগ্য প্রকাশনা হিসেবে বিবেচিত হবে বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

স্বীকার্য যে একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে এদেশের নারীরা মুক্তিযোদ্ধাদের স্নেহ, মমতা ও সেবা প্রদানের পাশাপাশি সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের জন্য সহায়তা করেছেন নানাভাবে। নারী-পুরুষের অংশগ্রহণ ছাড়া কোনো জনযুদ্ধ সফল হতে পারে না। আর সঙ্গতকারণে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ যুদ্ধের মতো বড় অর্জনে নারীর সার্বিক মূল্যায়ন করতে চায় না। পিছিয়ে পড়া নারী সমাজের অবমূল্যায়ন ঘটে তাদের হাতে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত ধারণায় একই মানসিকতা থেকে নারীকে অবমূল্যায়ন করা হয়েছে নানাভাবে। তাই প্রকৃত চিত্র উদ্‌ঘাটনের জন্য আমাদের এ প্রয়াস।

প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শে বিশ্বাসী বলে এই গৌরবময় অধ্যায়ের নানা বিষয় জনগণকে জানাতে চেষ্টা করছে। 'আমি নারী : আমি মুক্তিযোদ্ধা' এরই অন্যতম পদক্ষেপ। এ প্রচেষ্টা সফল করার জন্য আমার সহকর্মীবৃন্দ

নিরলস পরিশ্রম করেছেন। তাঁদেরকে শুধু ধন্যবাদ জানালে কম বলা হবে। দেশের বিশিষ্ট কথাশিল্পী সেলিনা হোসেনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই বইটি সম্পাদনা করে দেওয়ার জন্য। বইটি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য অন্যপ্রকাশের মাজহারুল ইসলাম ও আবদুল্লাহ্ নাসেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই।

আমাদের এ প্রচেষ্টার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাসের কিছু উপাত্ত প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত হলে প্রশিকার শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি।

ড. কাজী ফারুক আহম্মদ
প্রেসিডেন্ট
প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র

সম্পাদকীয়

পৃথিবীর কোনো মহৎ কাজই নারীর অবদান ব্যতীত পূর্ণতা লাভ করে নি। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে প্রতিটি স্বাধিকার আন্দোলনে নারী সমাজের ভূমিকা ছিল অন্যতম। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি রণাঙ্গনে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে, গেরিলা যুদ্ধে শত্রুর অবস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রেকির ভূমিকায়, মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে রন্ধনশালায়, হাসপাতালে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের শুশ্রূষায়, আন্তর্জাতিক বিশ্বের সহানুভূতি ও সমর্থন আদায়ের জন্য বিভিন্ন দূতাবাসে মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে গমন করে, সর্বোপরি স্বাধীনতাকামী জনগোষ্ঠীর মনোবল দৃঢ় রাখার উদ্দেশ্যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে শিল্পী হিসেবে অংশগ্রহণ করে এবং গঠিত সাংস্কৃতিক দলের সদস্য হিসেবে প্রবাসে বাংলাদেশের নারী সমাজ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। মুক্তিযুদ্ধে ব্যতিক্রমী অবদান রাখার জন্য পুরুষ মুক্তিযোদ্ধার পাশাপাশি বীরপ্রতীক খেতাব প্রদান করা হয় মুক্তিযোদ্ধা তারামন বিবিকে।

বীরত্বগাথার ক্ষেত্রে এমন অবদান রাখা সত্ত্বেও সাংগঠনিক প্রতিনিধিত্বের অভাবে অনেক নারী মুক্তিযোদ্ধা আড়ালে পড়ে থাকেন। তাঁদের অবদানকে স্বীকৃতি দেয়া দূরের কথা তাঁদের পরিচিতি সংরক্ষণ করার কাজটিও উপেক্ষিত হয়ে এসেছে দেশের স্বাধীনতার ৩৩ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও। অবশ্য মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণে ব্যাপৃত অনুসন্ধানীদের কাছে প্রতিনিয়ত মুক্তিযুদ্ধের অবদান রাখা নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমৃদ্ধ হচ্ছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বগাথা ও ত্যাগের ইতিহাস।

আমরা কি ভুলতে পারি কসবার কুল্লাপাথরের ৫১জন বীর মুক্তিযোদ্ধার সমাধিস্থল গড়ে ওঠার অতীত ইতিহাস! মুক্তিযোদ্ধা আবদুল করিমের মা মহিয়সী নারী তারজাতুন নেসা তার স্বামী আব্দুল মান্নানের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ নয় মাস এই এলাকায় এবং এলাকার আশেপাশে পাক হানাদার বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের লাশ বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করে এবং গোসল করিয়ে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বীরের মর্যাদায় দাফন করার দায়িত্ব পালন করেছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের সমাধিস্থল এবং লাশ ধোয়ানোর চৌকিটি যার স্মৃতি আজও বহন করে চলেছে। গোটা দেশেই নারী মুক্তিযোদ্ধাদের এরকম বীরত্বগাথা রয়েছে, যা এখনো মুক্তিযুদ্ধের নির্মম অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য বহন করছে।

সর্বোপরি স্বাধীনতার জন্য এ দেশের নারীরা বড় মূল্য দিয়েছে পাকসেনা ও রাজাকারদের হাতে শারীরিকভাবে নির্যাতিত হয়ে। আমরা স্বাধীনতার পরে তাঁদের যথাযথ সম্মান জানাতে পারি নি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁদেরকে 'বীরাঙ্গনা' সম্মানে ভূষিত করেছিলেন, কিন্তু আমাদের নিম্নমানের সামাজিক সাংস্কৃতিক রুচির কারণে আমরা তাঁদের অবদানের মূল্যায়ন করি নি। বীরাঙ্গনা নারীদের অবদান সঠিকভাবে মূল্যায়ন করার সময় হয়েছে। বীরাঙ্গনা বলে তাঁদেরকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার মানসিকতা থাকা উচিত নয়। আমি বীরাঙ্গনা শব্দটির মধ্যে কোনো ধরনের অগৌরব দেখি না। এটি একটি

গৌরবময়, মর্যাদাপূর্ণ শব্দ, যে নারী এই মূল্য দিয়েছেন তিনি আমাদের নমস্য। তাঁকে মাথায় তুলে রাখা উচিত। যে যেভাবে স্বাধীনতার জন্য মূল্য দিয়েছে সেই যোদ্ধা।

'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র' নামে ১৬টি খণ্ড গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এর একটি খণ্ডে পঁচিশ মার্চের গণহত্যা পরবর্তী সময়ের বিবরণ দিয়েছে ঢাকা শহরের ডোমেরা। তাদের বিবরণ পড়লে গা শিউরে ওঠে, বিশেষ করে রাজারবাগ পুলিশ লাইনের ডোম রাবেয়া খাতুন যে বর্ণনা করেছেন তা যেমন ভয়াবহ তেমন নৃশংস। তিনি বলেছেন, রাজারবাগ পুলিশ লাইনে যেসব মেয়েদের ধরে আনা হতো, তাদের শুধু ধর্ষণ করেই ক্ষান্ত হয় নি পাকসেনারা, নির্মমভাবে শরীরের বিভিন্ন অংশ টুকরো টুকরো করেছে। বিভিন্ন পদ্ধতিতে মেয়েদেরকে অত্যাচার করেছে। এমনকি রাজারবাগ পুলিশ ক্লাবে মেয়েদের উলঙ্গ করে লোহার রডের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। বিবরণ অজস্র আছে, পড়লে চোখ ভিজে যায় না, ঘৃণায় ক্রোধ জন্মায়।

যে-কোনো দেশে যে-কোনো কালে এ কথা সত্য যে, যুদ্ধ কিংবা রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ের সামাজিক দায়ভার এভাবেই বহন করতে হয় নারীদের। প্রাকৃতিক কারণেই একে অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই এই মূল্য দান যে-কোনো বড় অর্জনের অংশ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে এ দেশের নারীরা আরো অনেক ধরনের ত্যাগের বাইরেও স্বাধীনতার মতো বড় অর্জনের মধ্যে নিজেদের এভাবেই যুক্ত করেছে। কোনো বিচারেই এ ত্যাগের মূল্য ছোট করে দেখা উচিত নয়। যে যুবক চোখ এবং হাত বাঁধা অবস্থায় নিহত হয় এবং যে যুবতী লোহার শিকে ঝুলে মৃত্যুবরণ করে তাতে কোনো তফাত নেই। কারণ একটি— স্বাধীনতা।

মুক্তিযুদ্ধের এমন গৌরবগাথার ইতিহাস সংরক্ষণে একটি ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে আসে প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র। প্রশিকার মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সেলের উদ্যোগে ৩৯জন নারী মুক্তিযোদ্ধাকে জাতীয় পর্যায়ে সংবর্ধনা প্রদান করা হয় ২৬ মার্চ, ২০০৩ সালে। আর আসন্ন ২৫ মার্চ ০৪ দেশের ৫১জন নারী মুক্তিযোদ্ধার জীবনভিত্তিক প্রফাইল সংবলিত পুস্তক প্রকাশ করা হচ্ছে প্রশিকার পক্ষ থেকে। এ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে প্রশিকার প্রেসিডেন্ট ড. কাজী ফারুক আহম্মদের ব্যক্তিগত উৎসাহ ও সম্পৃক্ততা প্রশংসার দাবি রাখে।

এছাড়া প্রশিকার মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সেলের দেওয়ান রাশেদুল শাহীন, মোঃ আবু সাঈদ ও শাম্মিন সুলতানা মুন্নির অবদান অপরিসীম। মুক্তিযুদ্ধ সেলের এ দলটি দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় গিয়ে ৫১জন নারী মুক্তিযোদ্ধার জীবন, কর্ম ও বর্তমান অবস্থানের বর্ণনা সংগ্রহ করেছেন। নারী মুক্তিযোদ্ধাদের খোঁজ করার ক্ষেত্রে সংগ্রহকারী দলকে সহযোগিতা করেছেন উন্নয়ন কর্মী, সাংবাদিক, পেশাজীবী ও বিভিন্ন মুক্তিযোদ্ধা ভাই-বোনেরা, তাঁদের সবাইকে সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাই। এই বইয়ের সব উক্তি রচনা করেছেন আবু সাঈদ। তাঁর পরিশ্রম ও নিষ্ঠা আমাকে মুগ্ধ করেছে।

প্রকাশনা সংস্থা অন্যপ্রকাশ-এর সত্বাধিকারী মাজহারুল ইসলাম বইটি জরুরি ভিত্তিতে প্রকাশ করতে সম্মত হওয়ায় ব্যক্তিগতভাবে আমি কৃতজ্ঞ।

এ বইটি সম্পাদনা করার দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করায় আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছি। প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র কর্তৃক গৃহীত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সকল কার্যক্রম সফল হোক— এ প্রত্যাশা করছি।

তারিখ : ২৪ মার্চ, ২০০৪ — *সেলিনা হোসেন*

সূচিপত্র

করুণা বেগম
(বাবুগঞ্জ)

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় এদেশের নারীরা শুধু সেবা, মমতা আর প্রেরণাই যোগান নি। যে হাতে স্নেহ মায়া মমতা দিয়েছেন সে হাতে গর্জে উঠেছে আগ্নেয়াস্ত্র, ছিদ্র করেছে শত্রুবক্ষ। নারীদের এই বীরত্বগাথা ইতিহাস আজ অবহেলায়, অনাদরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে। নারী মুক্তিযোদ্ধাদের খুঁজতে আমি ঘুরে বেড়িয়েছি গ্রাম-গ্রামান্তরে, আনাচে-কানাচে। বরিশাল জেলার প্রত্যন্ত গ্রামে খুঁজে পেয়েছি এমন একজন বীর নারী যার নাম করুণা বেগম।

করুণা বেগমের সন্ধান পাই মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল থেকে প্রকাশিত মুক্তিবার্তা পত্রিকা থেকে। মুক্তিবার্তায় প্রকাশিত ঠিকানা অনুযায়ী বরিশাল জেলার মূলাদি থানার কাজির চর গ্রামে যাই করুণা বেগমের খোঁজে। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কাজির চর গ্রামে করুণা বেগমের সন্ধান পাই নি। এ প্রজন্মের অনেকেই জানে না করুণার কথা। পরে এক মুক্তিযোদ্ধার সহযোগিতায় খুঁজে পেলাম তাঁর ভাইয়ের ঠিকানা। তাঁর ভাইয়ের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানতে পাই করুণা বেগমের বর্তমান ঠিকানা।

ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কে দোয়ারিকা-শিকারপুর ফেরি ঘাটের মাঝে অবস্থিত রাকুদিয়া গ্রাম। এখানেই থাকেন আমাদের বীরযোদ্ধা করুণা বেগম। স্নেহের পরশ বোলানো নারিকেল, সুপারিসহ নানান জাতের বৃক্ষে শোভিত রাকুদিয়া গ্রামটি। গ্রামের দুপাশ দিয়ে বয়ে গেছে নদী। দক্ষিণাঞ্চলের সাথে রাজধানীর নদীপথে যোগাযোগের জন্য নদী দুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পড়ন্ত বেলায় গাছের ছায়ায় নদীর বুকে সবুজের আল্পনা। নয়নাভিরাম এ দৃশ্য দেখতে দেখতে বিকেল তিনটার দিকে রাকুদিয়া গ্রামে পৌঁছাই। ঐ গ্রামের একটা ছেলের সহযোগিতায় বাড়ি খুঁজে পাই। কথা হয় করুণা বেগমের সাথে। সহজ-সরল, হাসি-খুশি এক কুলবধূ করুণা বেগম। কে বলবে একাত্তরে তাঁর হাতে গর্জে উঠেছিল আগ্নেয়াস্ত্র, তাঁর বুলেটে বিদ্ধ হয়েছিল শত্রু বক্ষ!

করুণা বেগম ১৯৫৩ সালের ১০ জানুয়ারি মূলাদী থানার কাজিরচর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা খন্দকার শাহ আলী এবং মা জোবেদা বেগম। মুক্তিযুদ্ধের

কয়েক বৎসর আগে তাঁর বিয়ে হয় মূলাদী থানার কাজির চর গ্রামের শহীদুল হাসান চুন্নুর সাথে। চুন্নু ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল্‌সের চাকুরি ছেড়ে ১৯৭১ সালে গ্রামের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পাশাপাশি শহীদুল হাসান রাজনীতির সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে কাজির চর ইউনিয়নের আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন তিনি।

মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে করুণার স্বামী চুন্নু দেশপ্রেমিক যুবকদের সাংগঠনিকভাবে একত্রিত করে প্রশিক্ষণের জন্য ভারতে পাঠাতে থাকেন এবং নিজে স্থানীয়ভাবে দল গঠন করেন এবং বিভিন্ন শত্রু ছাউনিতে আঘাত হানার প্রস্তুতি নেন। সে সময়ে পাকিস্তানি মিলিটারির সাথে এদেশীয় কতিপয় রাজাকার করুণার স্বামী শহীদুল হাসান এবং এলাকার আরো কয়েকজন যুবককে ধরে নিয়ে জয়ন্তী নদীর তীরে দাঁড় করিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে এবং নদীতে ফেলে দেয়।

স্বামীর মৃত্যুর পরে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন করুণা। একমাত্র পুত্র মান্নানকে নিয়ে দুঃখের সাগরে হাবুডুবু খেতে থাকেন তিনি। কিছুদিন পরে স্বামীর মৃত্যুশোক দুর্দমনীয় শক্তিতে পরিণত হয়। স্বামীর আদর্শ, হত্যার প্রতিশোধ এবং দেশের মুক্তির জন্য অস্ত্র হাতে তুলে নেন তিনি।

করুণা বরিশাল জেলার মূলাদী থানার কুতুবউদ্দিনের নেতৃত্বে প্রশিক্ষণ নেন এবং কুতুব বাহিনীতে যোগ দেন। গেরিলা বাহিনীর অন্যতম সক্রিয় সদস্য ছিলেন করুণা। এই বাহিনীর সাথে তিনি ছাড়া আরো ৫০জন নারী মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। রাইফেল, স্টেনগান, গ্রেনেড ছোড়ার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন করুণা। এছাড়া তিনি যে-কোনো ধরনের বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহার সম্পর্কেও বিশেষ প্রশিক্ষণ লাভ করেন। গেরিলা যোদ্ধা হিসেবে কখনো ভিক্ষুক, কখনো বা গ্রামের কুলবধূ বেশে শত্রু-শিবির চিহ্নিত করা এবং সুযোগ বুঝে গ্রেনেড ছোড়া বা সময়মতো অপারেশন করা-ই ছিল তাঁর প্রধান কাজ।

করুণা সরাসরি সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন বরিশাল জেলার কাশিমাবাদ, বাটাজোর, কসবা, টরকি, নন্দিবাজার, মাহিলারা ও শিকারপুরে।

সশস্ত্রযুদ্ধের একটি স্মরণীয় ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে গর্জে ওঠেন তিনি। মুহূর্তের মধ্যে অগ্নিশর্মা রূপধারণ করেন করুণা। তিনি ফিরে যান একাত্তরের স্মৃতিতে। কান্না জড়িত কণ্ঠে তিনি বলেন, 'নভেম্বর মাসের শেষের দিকে, গৌরনদী থানার মহিলারা গ্রামে ছিল পাকিস্তানি বাহিনীর শক্তঘাঁটি। পাকিস্তানি সেনারা নিরীহ গ্রামবাসীর ওপর নির্মম অত্যাচার চালাচ্ছে। আমরা একদিন ঐ ঘাঁটি আক্রমণের পরিকল্পনা করি। আমরা ৫জন নারী মুক্তিযোদ্ধা এবং ১০জন পুরুষ যোদ্ধার একটি চৌকশ দল ঐ ঘাঁটি আক্রমণের পরিকল্পনা নেই যার নেতৃত্ব দেই আমি নিজেই। পর পর ৪/৫টি গ্রেনেড ছুড়ে আক্রমণের সূচনা করি। চার ঘণ্টা স্থায়ী এই যুদ্ধে ১০জন শত্রুসেনা হতাহত হয় এবং মুক্তিসেনাদের মধ্যে আমি নিজে আহত হই। আমার পায়ে গুলি লাগে। গুলিবিদ্ধ

অবস্থায় আমি সাধারণ কুলবধূর বেশে মূলাদী থানা হাসপাতালে ভর্তি হই। তখনো দেশ স্বাধীন হয় নি। ওই হাসপাতালে পর্যাপ্ত চিকিৎসার সুবিধাদি না থাকায় আমি সাধারণভাবে চলাচল শক্তি হারাই। স্বাধীনতার পরে আমি বরিশাল হাসপাতাল এবং পরে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ করি।'

দেশ স্বাধীন হলেও আর্থিক মুক্তি আসে নি করুণার। জীবন ও জীবিকার জন্য তাঁকে সংগ্রাম করতে হয়েছে একমাত্র ছেলে আব্দুল মান্নানকে বাঁচানোর জন্য। ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত দুইটি রাষ্ট্রীয় ভাতা (শহীদ স্বামীর ও নিজে আহত মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে) পেলেও তা ছিল চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল।

দারিদ্র্যের কষাঘাত এবং পারিপার্শ্বিকতার কারণে দ্বিতীয় বিয়ে করতে বাধ্য হন তিনি। দ্বিতীয় বিয়ে করেন বাবুগঞ্জ থানায় দেহেরগতি ইউনিয়নের রাকুদিয়া গ্রামের গোলাম মোস্তফাকে। গোলাম মোস্তফার সংসারে তাঁর তিন মেয়ে এবং দুই ছেলে। অগ্নিঝরা দিনগুলোর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে কান্নাজড়িত কণ্ঠে তিনি বলেন, 'আমি যুদ্ধে গিয়েও আমার স্বামী হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারলাম না। দেশবাসী যেন তাদের ক্ষমা না করে। আল্লাহ যেন বিচার করে।'

কারা আপনার স্বামীকে হত্যা করেছে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'আমি নাম বলে নিরাপত্তা হারাতে চাই না। আমি যুদ্ধে গিয়েও প্রতিশোধ নিতে পারলাম না। এটা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃখ। এ দুঃখ আমাকে আজীবন কুরে কুরে খাচ্ছে।'

আশালতা বৈদ্য
(কোটালিপাড়া)

মহান মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে বাঙালিদের ওপর নেমে আসে সীমাহীন নির্যাতন। পাকবাহিনীর হিংস্র থাবা থেকে মুক্তি পাবার জন্য এদেশের প্রায় এক কোটি লোক শরণার্থী হিসেবে ভারতে আশ্রয় নেয়। একই সময় মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের লক্ষ্যে ভারতে সশস্ত্র প্রশিক্ষণও নেয় হাজার হাজার তরুণ-তরুণী। একইভাবে দেশের অভ্যন্তরেও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈনিকদের তত্ত্বাবধানে গড়ে ওঠে প্রশিক্ষণ শিবির। স্বদেশে প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে দেশ মাতৃকার মুক্তির জন্য এদেশের দামাল ছেলেরা ঝাঁপিয়ে পড়ে মুক্তি সংগ্রামে। এই মহান মুক্তিযুদ্ধে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও রেখেছে প্রশংসনীয় অবদান। বিভিন্ন জায়গায় পাকবাহিনীর ওপর প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে নারীরা। স্থানীয়ভাবে প্রশিক্ষণ পেয়ে নিজেদেরকে প্রকাশ করেছেন একজন সফল যোদ্ধা হিসেবে। এমন একজন নারী আশালতা বৈদ্য।

১৯৫৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়া থানার সাদুল্লাহপুর ইউনিয়নের লাটেংগা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারে আশালতা বৈদ্যের জন্ম। তাঁর বাবা হরিপদ বৈদ্য ছিলেন একজন স্কুল শিক্ষক এবং মা সরলাময়ী বৈদ্য গৃহিণী।

একাত্তর সালের মে মাসে পাকসেনারা ঘিরে ফেলে পূর্ববাংলার প্রায় সকল গ্রামগঞ্জ। নির্বিচারে হত্যা করে নিরীহ গ্রামবাসীকে। ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। সমগ্র বাঙালি জাতির ওপর নেমে আসে সীমাহীন নির্যাতন। বাধ্য হয়ে শরণার্থী হিসেবে ভারতে আশ্রয় নেয় লাখ লাখ নিরীহ মানুষ। পাকবাহিনীর এই সীমাহীন নির্যাতনে ক্ষিপ্ত ও প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন আশালতা বৈদ্য।

একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আশালতারা দু'বোন পূর্ণ যুবতী। রাজাকারদের লোলুপ দৃষ্টি পড়ে তাদের দু'বোনের ওপর। আশালতার বাবা হরিপদ বাবু ছিলেন এলাকার স্থানীয় এবং মোটামুটি অর্থশালী ব্যক্তি। রাজাকারেরা আশালতাদের বাড়িঘর দখলের হীন পাঁয়তারা করেছিল। তারা আশার বাবার নিকট ছয় লক্ষ টাকা

দাবি করে। টাকা না দিতে পারলে আশালতাকে আর তাঁর বোনকে রাজাকারদের হাতে তুলে দিতে বলে। হুঙ্কার দিনে এক'দুবার তারা আশালতার বাবাকে শোনায়। অবশেষে রাজাকারেরা আশালতার বাবাকে এক সপ্তাহ সময় দেয়। এক সপ্তাহের মধ্যে টাকা দিতে না পারলে তারা আশালতাদের দুই বোনকে তুলে নিয়ে যাবে।

মেয়েদের রক্ষার চিন্তায় আশালতার বাবা বিমূঢ়। আশালতাদের নিয়ে ভারত যাবে না দেশে থাকবে, এটা নিয়েই চিন্তিত আশালতার বাবা। এ ঘটনা হেমায়েত বাহিনীর প্রধান হেমায়েত উদ্দিন জানতে পেরে এক রাতে আশালতাদের বাড়িতে আসেন এবং তাঁর বাবাকে ভারত যাওয়া থেকে নিবৃত্ত করেন। তিনি আশালতাকে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য প্রস্তাব দেন। নিজেদের রক্ষার জন্য আশালতা হেমায়েত উদ্দিনের প্রস্তাবে সম্মত হন এবং মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন।

আশালতার প্রথম প্রশিক্ষণ হয় কোটালিপাড়া থানার লেবুবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। এটা ছিল মহিলাদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এখানে ৪৫জন নারী মুক্তিযোদ্ধার প্রথম ব্যাচের প্রশিক্ষণ হয়। এরপর তিনি প্রশিক্ষণ নেন কোটালিপাড়া থানার নারিকেল বাড়ি হাইস্কুল মাঠে। এই নারিকেল বাড়ি ছিল হেমায়েত বাহিনীর আর একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। এখানে তাঁরা নারী পুরুষ সম্মিলিতভাবে প্রশিক্ষণ নেন। তিনি গেরিলা প্রশিক্ষণ নেন ভাংগারহাট হাইস্কুল মাঠে। নারিকেল বাড়ি ও লেবুবাড়ির মতো আরো একটা প্রশিক্ষণকেন্দ্র ছিল জহুরকান্দি স্কুলে। এখানে সুইসাইড স্কড পরিচালনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন তিনি। বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি সর্বমোট তিন মাসের সমরবিদ্যা বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি যে-সমস্ত আগ্নেয়াস্ত্রের প্রশিক্ষণ নেন সেগুলো হলো— ৩০৩ রাইফেল, পিস্তল, গ্রেনেড ও বিভিন্ন ধরনের বিস্ফোরক ব্যবহার। হেমায়েত উদ্দিন, কমলেশ বাবু ও বাবুল আক্তার তাঁদের এই প্রশিক্ষণ দেন। মহিলাদের প্রশিক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা শেখ জবেদ আলী। সমরাস্ত্রের পাশাপাশি তিনি চিকিৎসার জন্য ফার্স্ট এইড এবং গোয়েন্দাবৃত্তির কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণও গ্রহণ করেন।

আশালতা সরাসরি বেশ কয়েকটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এরমধ্যে ঘাগর বাজার যুদ্ধ, কলাবাড়ির যুদ্ধ, রামশীল পায়শারহাট যুদ্ধ বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য। এই যুদ্ধক্ষেত্রগুলো ছিল গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়া থানার অন্তর্গত। এ সকল যুদ্ধ, হেমায়েত উদ্দিন ও কমলেশ বাবুর সরাসরি কমান্ডিং-এ পরিচালিত হয়। উল্লিখিত যুদ্ধে আশালতা সরাসরি অংশগ্রহণ করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এছাড়া হেমায়েত উদ্দিনের নির্দেশ ও সহযোগিতায় ২৪জন সশস্ত্র নারী গেরিলাদের গঠিত একটা দলের কমান্ডার নিযুক্ত হন তিনি। শত্রুর অবস্থান জানার জন্য রেকি করা, বিভিন্ন ছদ্মবেশী রূপে সশস্ত্র আক্রমণ করা সুইসাইড স্কড হিসেবে কাজ করা ছিল এই গ্রুপের অন্যতম দায়িত্ব। সশস্ত্র যুদ্ধে আত্মাহুতি বাহিনীর মতো কাজ করতে তাঁরা থাকতেন সর্বদা প্রস্তুত। হেমায়েত উদ্দিনের নির্দেশে দেশ স্বাধীনের পূর্ব পর্যন্ত তিনি তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন।

মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য তিনি এ সমাজের নিকট থেকে পেয়েছেন সীমাহীন গঞ্জনা। গোচরে-অগোচরে এ সমাজ নানাভাবে কটূক্তি করেছে তাঁকে নিয়ে। নীরবে তিনি এসব অপবাদ সহ্য করেছেন। মাঝে মাঝে তাঁর নিজের ওপর ভীষণ ঘৃণা হয়েছে। তিনি আফসোস করে বলেন, আমরা যখন পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছি তখন মানসম্মান যায় নি। যখন মা-বোনদের রক্ষা করেছি তখন সম্মান যায় নি। তখন আমরা তাদের কাছে ছিলাম সম্মানীয়। দেশ স্বাধীনের পরে সমাজের নিকট নারী যোদ্ধাদের প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়। নারীযোদ্ধাদের সইতে হয় নানান রকম সামাজিক ধিক্কার।

দেশ স্বাধীনের পরে এসএসসি, এইচএসসি এবং বাংলায় অনার্সসহ মাস্টার্স পাশ করেন আশালতা বৈদ্য। ছাত্র-জীবন থেকে এ পর্যন্ত তিনি বিভিন্নমুখী সমাজকল্যাণমূলক সংস্থার সাথে জড়িত আছেন। বর্তমানে সূর্যমুখী সমাজকল্যাণ সংস্থার নির্বাহী পরিচালক হিসেবে কাজ করছেন আশালতা।

আশালতা সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পেরে গর্বিত। মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য এখন অবশ্য আত্মীয়স্বজনসহ পরিবারের সকলে তাকে শ্রদ্ধা করে।

রোকেয়া বেগম
(পঞ্চগড়)

পঞ্চগড় চিনির মিল কমান্ড কাউন্সিলের কমান্ডার বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা জনাব ইয়াসিন আলী ভূঞার নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মুক্তিযোদ্ধা রোকেয়া বেগমের খোঁজে পঞ্চগড়ে যাই। প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্যমণ্ডিত পঞ্চগড় আম ও লিচু বাগানে শোভিত। মাঠে প্রচুর আখ। ঢাকা থেকে দেবীগঞ্জে গিয়ে পৌছাই রাতে। সেখানে রাতে থেকে পরদিন কুয়াশাঘেরা সকালে পঞ্চগড়ের উদ্দেশে রওনা হই। রাস্তার দু'পাশে প্রশিকার লাগানো নানাজাতের ফলজ ও বনজ বৃক্ষ। রাস্তার দু'পাশে অড়হর ও কলাইয়ের ক্ষেত। রবিশস্যের প্রাচুর্যে ভরপুর প্রকৃতি। দেখে নয়ন জুড়িয়ে যায়। মনের অজান্তে চোখের সামনে ভেসে ওঠে একাত্তর। এই অনাবিল সৌন্দর্যের লীলাভূমি, আমার সোনার বাংলাদেশকে দুর্ধর্ষ মুক্তিযোদ্ধারা রণক্ষেত্র বানিয়েছিল। সীমাহীন শোষণ, নির্যাতন এবং অসম অর্থনীতির মুক্তির জন্য দামাল ছেলেমেয়েরা মুক্তির সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। পুরুষের পাশাপাশি রোকেয়া বেগমও মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন।

রোকেয়া বেগম ১৯৫৫ সালের ৫ মে, পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়া থানার তীরনইহাট ইউনিয়নের মনিগঞ্জ গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা মৌলভী আঃ রহিম এবং মা সোমিরন নেছা। চার ভাইবোনের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। ছোটবেলা থেকে তিনি রোগাটে এবং শান্ত প্রকৃতির ছিলেন। বৃদ্ধ বাবা তাঁকে ভীষণ আদর করতেন এবং লেখাপড়ার জন্য উপদেশ দিতেন। মনিগঞ্জ প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে তিনি ৫ম শ্রেণী এবং শালবাহান হাইস্কুল থেকে এসএসসি পাশ করেন। ৮ এপ্রিল ১৯৬৮ সালে ময়মনসিংহ জেলার মোসলেম উদ্দিনের সাথে তাঁর বিয়ে হয়। একাত্তরে ষোড়শী রোকেয়া স্বামীর নিকট থেকে পাকিস্তানিদের বর্বরতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পেয়েছিলেন।

১৯৭১ সালে এপ্রিল মাসে পাকবাহিনী তাদের এদেশের দোসরদের সহযোগিতায় ব্যাপক ধ্বংসযোগ্য চালাতে শুরু করলে রোকেয়া বেগম তাঁর স্বামীর সাথে ভারতে চলে যান।

তাঁর স্বামী একাত্তরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। মোসলেমউদ্দিন ছিলেন স্বাধীনতার সপক্ষে একজন মুক্তিপাগল মানুষ। পাকিস্তানিদের শোষণ-নির্যাতনের কথা বিভিন্ন সময়ে পরিবারের সকল সদস্যদেরকে বলতেন। মোসলেমউদ্দিন আরো বলতেন, 'ওরা আমাদের ছাড়বে না, পারলে জীবনে মারবে।' ভারতে যাবার পথে ইয়াসিন নামক এক পুলিশ সদস্যের সাথে তাঁদের পরিচয় হয়। ইয়াসিন সাহেব রোকেয়া ও তাঁর স্বামীকে ডা. আতিয়ার রহমানের নিকট নিয়ে যান, জলপাইগুড়ি জেলার দেবগ্রাম শরণার্থী ক্যাম্পে। ডা. আতিয়ার রহমানের সহযোগিতায় প্রথমে শরণার্থী ক্যাম্পে এবং পরে মে মাসের প্রথম দিকে রোকেয়া বেগম সেবিকা হিসেবে অস্থায়ী হাসপাতালে যোগ দেন।

ডা. আতিয়ার রহমানের নিকট থেকে প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এই প্রশিক্ষণ হয় হাতে-কলমে। নার্সিং প্রশিক্ষণের পাশাপাশি গ্রেনেড ছোড়া ও বিভিন্ন বিস্ফোরক দ্রব্যের ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণও গ্রহণ করেন তিনি। আগ্নেয়াস্ত্রের এ প্রশিক্ষণ দেয়া হয় পাকিস্তানবাহিনী বা রাজাকারদের আক্রমণের যে-কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য। ১৫ দিনের একটা প্রশিক্ষণ কোর্স শেষ করে তিনি কাজ শুরু করেন তেঁতুলিয়া অস্থায়ী হাসপাতালে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তেঁতুলিয়া এলাকা ছিল তখন শত্রুমুক্ত।

দিনে আহত মুক্তিযোদ্ধারা আসত। আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হতো অস্থায়ী হাসপাতালে। তাঁদের অবস্থা বেশি খারাপ হলে সরকারি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়া হতো। সেবিকা হিসেবে তিনি সাধারণত ক্ষতস্থান পরিষ্কার করা, ব্যান্ডেজ করা, ইনজেক্শন পুশ করা, সময়মতো ঔষধ খাওয়ানোর কাজ করতেন। এছাড়া ছোট অপারেশনের ক্ষেত্রে তিনি ডাক্তারদের সাথে থাকতেন। আহত মুক্তিযোদ্ধাদের পুরো পাঁচ মাস চিকিৎসা সেবা দিয়েছেন তিনি। সেবিকা হিসেবে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন এবং প্রশংসিত হন।

হাসপাতালে কর্মরত সময়ের অনেক স্মৃতি আজও তাঁকে ব্যথিত করে তোলে। এমন একটা ঘটনা বর্ণনা করলেন তিনি। তিনি বলেন, 'অস্থায়ী হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা দিতে গিয়ে একটা ঘটনা আজও আমাকে নাড়া দেয়। ঠাকুরগাঁয়ের একটি ছেলের বোমার আঘাতে একটা পা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাকে তেঁতুলিয়া অস্থায়ী হাসপাতালে তাৎক্ষণিকভাবে আনা হয়। আহত ছেলেটির বয়স ১০-১২ বৎসর হবে। অচেতন অবস্থায় ছেলেটিকে হাসপাতালে নিয়ে আসে। ৪-৫ ঘণ্টা পরে ছেলেটির জ্ঞান ফেরে কিন্তু তাঁর মুখে কোনো ভাষা নেই। শুধু এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। চোখে তার শত জিজ্ঞাসার চিহ্ন। কয়েক মিনিটের মধ্যে আবার জ্ঞান হারায়। ছেলেটাকে ব্যান্ডেজ করার সময় আমার ভীষণ খারাপ লেগেছে। আমি জানি, এই পা আর জোড়া লাগানো যাবে না। ছেলেটি চিরতরে পঙ্গু হয়ে গেল। ব্যান্ডেজ করার পরে রক্ত বন্ধ করা গেল না। উপায় না দেখে তাকে ঠাকুরগাঁ হাসাপাতালে পাঠানো হলো। কারণ

ঠাকুরগাঁ তখন স্বাধীন হয়েছে এবং চিকিৎসার মানও ভালো। ঘটনাটি মনে হলে আজও আমি শিউরে উঠি। আহত ছেলেটিকে দেখতে আমি ঠাকুরগাঁ হাসপাতালে গিয়েছিলাম। যুদ্ধে পুনরায় যোগদানের জন্য ছেলেটির ব্যাকুলতা সেদিন যে দেখেছি তা ভুলবার নয়।'

রোকেয়া কখনো ভাবতে পারে নি, দেশ এত দ্রুত স্বাধীন হবে। যুদ্ধ শেষ হয়েছে। সবাই যার যার ঘরে ফিরেছে। রোকেয়াও তার ঘরে ফিরেছেন। ১৯৭৮ সালের ২৩ আগস্ট রোকেয়া এক কন্যাসন্তানের মা হন। তিরস্কার ও গ্লানি নিয়েও সংসার করতে চেয়েছিলেন রোকেয়া কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভাগ্যে তার সুখ সইল না। স্বামীর সাথে বিচ্ছেদ ঘটে ৩১ আগস্ট ১৯৭৯ সালে। একাত্তরে সেবিকার অভিজ্ঞতা তাকে পঞ্চগড় চিনিকলে চাকুরি পাইয়ে দিতে সহায়তা করল। আর সে অবদি পঞ্চগড় চিনি মিল হাসপাতালে সেবিকা হিসেবে কর্মরত আছেন রোকেয়া।

রোকেয়ার মেয়েটির বিয়ে হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য তাঁর জামাই-মেয়ে দুজনেই গর্বিত। রোকেয়াকে তারা ভীষণ শ্রদ্ধা করে।

মুক্তিযুদ্ধের ৩৩ বছর পর তার মতামত জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান, 'আজ নকল মুক্তিযোদ্ধারা আসল মুক্তিযোদ্ধা সেজেছে। আর প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধারা হচ্ছে নিগৃহীত। আমার আহ্বান সরকার ও সমাজের নিকট— এ যুগের ছেলেমেয়েদের মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানানোর ব্যবস্থা করুন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের মূল্যায়ন করুন।' মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য ভীষণভাবে গর্বিত রোকেয়া। একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ, স্বামীর সংসার সবই এখন রোকেয়ার নিকট স্মৃতি, শুধুই স্মৃতি।

আকলিমা খন্দকার
(রংপুর)

রূপালী ব্যাংকের ম্যানেজার তোফায়েল ভাইয়ের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে খুঁজে পাই আকলিমাকে। রংপুর শহরতলীর এক ছায়াঘেরা মনোরম পরিবেশে থাকেন আকলিমা। তার সঙ্গে কথা হয় ১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ তারিখে। তাঁর নাম আকলিমা খন্দকার। পিতা খন্দকার আদম হোসেন এবং মাতা আজিজা খন্দকার। ভারতের কুচবিহারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অবিবাহিতা, আট ভাই-বোনের মধ্যে দ্বিতীয়। ছোটবেলা থেকে তিনি ছিলেন চটপটে এবং মিশুক। কুচবিহার থেকে প্রাইমারি পাশ করার পর বাবার সাথে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমানে বাংলাদেশ) চলে আসেন এবং রংপুর জেলা সদরে বসবাস করেন।

মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অংশগ্রহণ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান, 'পরাধীনতা এবং পাকিস্তানিদের দুঃশাসন ও শোষণ সম্পর্কে আমার স্পষ্ট ধারণা ছিল'। ১৯৭১ সালের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী আকলিমা খন্দকার পাকবাহিনী ও বিহারিদের নিষ্ঠুরতম নির্যাতন, হত্যা, ধর্ষণের বিভৎস চিত্র দেখে পরিবারের সাথে ভারতের কোচবিহার জেলার দিনহাটা চলে যান।

বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী বুড়িমারি গ্রামের ওপাশে ভারতের সীমান্ত এলাকা চ্যাংড়াবান্দায় অস্থায়ী হাসপাতাল ছিল। ওই হাসপাতালে নার্স হিসেবে কাজ করার জন্য একাত্তরের জুলাই মাসের দিকে ৬ নং সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার, উইং কমান্ডার এম.কে বাশারের নির্দেশে শরণার্থী শিবিরগুলো থেকে শিক্ষিত মেয়েদের খোঁজ করা হচ্ছিল। সে সময় তিনি মাহমুদা ইয়াসমিন, মমতাজ বেগমসহ আরো কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে নার্স হিসেবে হাসপাতালে যোগ দেন। নার্স হিসেবে ১৫ দিনের স্বল্প মেয়াদি একটি প্রশিক্ষণ হয় তাঁদের। তাঁর প্রশিক্ষক ছিলেন ডা. মতিউর রহমান। প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ হয়েছে মূলত হাতেকলমে। মেজর নওজেসের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আগ্নেয়াস্ত্র প্রশিক্ষণ নেন আকলিমা খন্দকার। তিনি যে সমস্ত অস্ত্রের প্রশিক্ষণ নেন তার মধ্যে গ্রেনেড ও বিভিন্ন ধরনের বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহার

অন্যতম। নভেম্বর মাসের শেষদিকে প্রশিক্ষণ শেষে তিনি চ্যাংড়াবান্দা হাসপাতালে কাজ শুরু করেন। লালমনিরহাট স্বাধীন হবার পরে লালমনিরহাট রেলওয়ে হাসপাতালে যোগদান করেন আকলিমা। অস্থায়ী হাসপাতালসহ লালমনিরহাট রেলওয়ে হাসপাতালে যুদ্ধ চলাকালে তিনি যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সরাসরি চিকিৎসা সেবা দিয়েছেন। দেশ স্বাধীনের পূর্ব পর্যন্ত তিনি ওই হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন। আহত যোদ্ধাদের ক্ষতস্থান পরিষ্কার করা, ইনজেকশন পুশ করা, সময় মতো ঔষধ খাওয়ানো ছিল তাঁর মূল কাজ। আহতদের অবস্থা বেশি খারাপ হলে অস্থায়ী হাসপাতাল থেকে জেলা সদর হাসপাতালে পাঠানো হতো। এই কাজগুলো তিনি করেছেন অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'এত দ্রুত দেশ স্বাধীন হবে, কখনো ভাবতে পারি নি। সিদ্ধান্ত হয়েছিল, আমাদের আরো ভারী অস্ত্রের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে কিন্তু ১৬ ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হওয়ার কারণে আমাদের আর ভারী অস্ত্রের প্রশিক্ষণ নেয়া হয় নি।' মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করেন এবং প্রশংসিত হন।

স্বাধীনতার পরে তিনি রংপুরে ফিরে আসেন এবং ১৯৭২ সালে এইচএসসি পাশ করেন। বর্তমানে জেলা হিসাবরক্ষণ অফিসে কর্মরত তিনি।

তিনি অনুযোগ করে আরো বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধে আমার অংশগ্রহণের কথা বলে কী লাভ! দেশের হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধারা আজ অবহেলিত, নিগৃহীত। আর নারী মুক্তিযোদ্ধা বললে মানুষ বোঝে বীরাঙ্গনা হিসেবে। যে দেশে মুক্তিযোদ্ধাদের মূল্যায়ন ও মর্যাদা নাই, সে দেশে নারী মুক্তিযোদ্ধাদের পরিচয় জেনে কী হবে?'

দেশের মানুষের কাছে তার চাওয়া-পাওয়া সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন— 'নতুন করে চাইবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। আমরা তো স্বাধীনতা অর্জন করেছি। এখন প্রয়োজন সেই স্বাধীনতাকে বাঁচিয়ে রাখা। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা চর্চার মধ্যে দিয়েই কেবল অর্জিত হতে পারে বাঙালির আকাঙ্ক্ষা। ইতিহাস বিকৃত, স্বাধীনতাবিরোধীদের তৎপরতা বন্ধ করার দায়িত্ব তো নতুন প্রজন্মের মানুষের ওপর। আমাদের সময় এসেছে এই উপলব্ধির। না হলে আমরা ভেসে যাব, তলিয়ে যাব পরাধীনতার অন্ধকারের অতল গভীরে।'

মোছাঃ সরিফা খাতুন
(ভোলাহাট)

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মতো চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ভোলাহাট থানারও একটি স্বতন্ত্র তাৎপর্য রয়েছে। ভৌগোলিক দিক থেকে ভোলাহাট একেবারে ভারতের কোলঘেঁসে অবস্থিত এবং নদী দ্বারা বেষ্টিত। এ কারণে ভোলাহাট এলাকাটা যুদ্ধ চলাকালে শত্রুমুক্ত ছিল। ভোলাহাট থানায় গিলাবাড়ি নামক স্থানে ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং অস্থায়ী হাসপাতাল। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য আসা নারী-পুরুষ প্রশিক্ষণ নিয়েছে এখানে। ভোলাহাটেরই এগারজন নারী এই ক্যাম্প থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ও নার্সিং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং সক্রিয় অবদান রাখেন। এদের মধ্যে শরিফা খাতুন অন্যতম।

সরিফা খাতুনের সন্ধান দেন তাঁর সহযোদ্ধা মেহেরুন নেছা, সুরাইয়া বেগম, মেহেরুন নাহার, তসলিমাসহ অনেকে। সরিফা খাতুনের জন্ম ২১ জুলাই ১৯৫৪ সালে, ভোলাহাট থানার তেলিপাড়া গ্রামে। তাঁর বাবা হাফিজউদ্দিন মণ্ডল এবং মা এলাচী বেগম। আট ভাই-বোনের মধ্যে সরিফা খাতুন ষষ্ঠ।

সরিফা খাতুনের সাথে কথা হয় ভোলহাটে তাঁর বাড়িতে। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান— মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর বয়স ছিল সতের বছর। একাত্তরের মে মাসে ভোলাহাটের পাশের থানা গোমস্তাপুরে পাক মিলিটারি অবস্থান গ্রহণ করে এবং রাজাকার নিয়োগ করে। ভোলাহাট থানা নদী দ্বারা বেষ্টিত ভারতের কোলঘেঁসে অবস্থিত বলে অন্যান্য থানার তুলনায় ছিল অনেকটা নিরাপদ। শরণার্থী ও মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য আসা অগণিত মানুষের নিকট থেকে তারা পাকবাহিনীর অত্যাচারের সংবাদ জানতে পারতেন। পাকবাহিনী গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিচ্ছে। তাদের সহযোগিতায় ঘরবাড়ি লুটপাট করছে রাজাকাররা। নির্যাতন করছে নারীদের।

পাকিস্তানিদের এই নির্মম নির্যাতন দেখে, সহযোদ্ধা বান্ধবীদের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে এবং তাঁর দেশপ্রেম তাঁকে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে।

মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের ক্ষেত্রে তাঁকে সার্বিক সহযোগিতা করেছে— কমান্ডার হাফিজউদ্দিন হাসনু। ৭ নং সেক্টরের ৩ নং সাব-সেক্টরের আওতায় ছিলেন সরিফা খাতুন। তাঁদের যুদ্ধকালীন কমান্ডার ছিলেন হাফিজউদ্দিন হাসনু এবং নিজাম উদ্দিন।

আগস্ট মাসের শেষদিকে তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি রিক্রুট হন গিলাবাড়ি ক্যাম্পে। তাঁর প্রশিক্ষণ হয় প্রথমে গিলাবাড়ি ক্যাম্প এবং পরে ভারতের আদমপুর ক্যাম্পে। আদমপুর ক্যাম্প বাংলাদেশের গিলাবাড়ি ক্যাম্পের উল্টোদিকে অবস্থিত। তিনি প্রথমে নার্সিং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। নার্সিং প্রশিক্ষণ দেন ডা. ইয়াসিন, ডাক্তার বকুল এবং ডাক্তার জসিম। নার্সিং প্রশিক্ষণ হয় মূলত হাতে-কলমে। নার্সিং প্রশিক্ষণের পাশাপাশি তিনি আগ্নেয়াস্ত্র প্রশিক্ষণও গ্রহণ করেন। আগ্নেয়াস্ত্র বিষয়ে প্রশিক্ষণের মধ্যে পিটি-প্যারেড, গ্রেনেড ও রাইফেল চালনা অন্যতম। কমান্ডার হাফিজউদ্দিন হাসনু এবং কমান্ডার নিজাম উদ্দিন তাঁদের এই প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। যে-কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য তাঁদেরকে এই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল।

আহতদের ক্ষতস্থান পরিষ্কার করা, ব্যান্ডেজ করা, নিয়মিত ঔষধ খাওয়ানো এবং সার্বক্ষণিক তদারকিই ছিল নার্স হিসেবে তাঁর নিয়মিত কাজ। ছোট ছোট অপারেশনের সময়ও তিনি ডাক্তারদের সাথে থেকে অপারেশন কাজে সহযোগিতা করেছেন। স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত অতিশয় আন্তরিকতার সাথে তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। এ কারণে ডাক্তাররা অনেক সময় তাঁর কাজের প্রশংসা করতেন। তিনি কখনো ভাবতে পারেন নি এত দ্রুত দেশ স্বাধীন হবে।

আজ বত্রিশ বছর পর হাসপাতালে তাঁর কাজের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'একাত্তরে মুক্তিযোদ্ধাদের যে মনোবল ও দৃঢ়তা আমি দেখেছি এখন তরুণদের মধ্যে তেমনটি দেখা যায় না। অসুস্থ অবস্থায়ও তাদের দ্রুত সেরে ওঠার জন্য ছটফট করা এবং আবার যুদ্ধে যাবার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা; সে কী আকুতি! যা আমি কখনো ভুলব না।'

যুদ্ধের সময় সবচেয়ে ভয়াবহ এবং হৃদয় বিদারক অবস্থা ছিল আহতদের আর্তনাদ। একাত্তরের স্মৃতি এখনো পীড়া দেয় সরিফাকে। গোমস্তাপুর থানার রহনপুর যুদ্ধক্ষেত্রে পাকবাহিনীর বাংকারে নির্যাতনের যে চিত্র দেখেছেন, তা আজও মনে হলে আঁতকে ওঠেন সরিফা। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পেরে তিনি গর্বিত। কারণ দেশের জন্য, মানুষের জন্য, মানুষের মুক্তির জন্য কিছু করতে পেরেছেন তিনি। তবে যে আশা নিয়ে তিনি মুক্তিযুদ্ধ করেছেন তা পূরণ হয় নি বলে দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন— আজ অমুক্তিযোদ্ধাদের ভিড়ে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধারা হারিয়ে যাচ্ছে। আর নারী মুক্তিযোদ্ধা বলতে সমাজ এখনো বোঝে বীরাঙ্গনা নারীদের। তিনি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রকৃত সম্মান, শ্রদ্ধা ও মর্যাদার সাথে বাঁচতে চান।

রোকেয়া বেগম হেনা
(পিরোজপুর)

৯ নং সেক্টরের সাব-সেক্টর কমান্ডার মেজর জিয়াউদ্দিন (অব.) ও মুক্তিযোদ্ধা এম. এ. মান্নানের কাছ থেকে জানতে পাই মুক্তিযোদ্ধা রোকেয়া বেগম হেনার কথা। রোকেয়া বেগম হেনার খোঁজে পিরোজপুরের উদ্দেশে রওনা হই ১১ অক্টোবর ২০০২ সালে। ঢাকা থেকে বাস যোগে পিরোজপুর পৌঁছালাম বেলা তিনটার দিকে। হাজার বছরের পুরনো জনপদ পিরোজপুর। পুরনো জনপদ হলেও যোগাযোগ ব্যবস্থার তেমন উন্নয়ন ঘটে নি। আদিকালে একমাত্র নৌপথই ছিল এখানকার যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। পুরো এলাকা জুড়ে রয়েছে নারিকেল, সুপারিসহ নানান জাতের বৃক্ষরাজি। এই সুন্দর দৃশ্য দেখতে দেখতে মুক্তিযোদ্ধা এম. এ. মান্নানের সাথে একটা রিকশা নিয়ে পৌঁছালাম রোকেয়া বেগমের বাসায়। রোকেয়া বেগমের বাসা পিরোজপুরের রাজারহাট এলাকায়। রোকেয়া বেগম থাকেন তাঁর মায়ের বাসায়। মায়ের অবর্তমানে তিনি ভাইবোনদের আগলে রেখেছেন মাতৃস্নেহে। রোকেয়ার বাসার পশ্চিম পাশে বলেশ্বর নদী। এই বলেশ্বর নদীর পাড়ে ছিল একাত্তরের আর একটি বধ্যভূমি।

রোকেয়া বেগম হেনা ১৯৫২ সালের ১৭ জানুয়ারি তৎকালীন পিরোজপুর মহকুমা সদরের রাজারহাট মহল্লায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা হাবিবুর রহমান এবং মা আমেনা বেগম। চার ভাই ও পাঁচ বোনের মধ্যে রোকেয়া বেগম দ্বিতীয়। ছোটবেলা থেকেই তিনি লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা করতেন, গান শিখতেন এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সাথে যুক্ত থাকতেন।

একাত্তরে ম্যাট্রিক পাশ করেন। রোকেয়া বেগম হেনা ছিলেন অত্যন্ত রাজনীতি সচেতন ব্যক্তি। ছাত্রজীবন থেকে ছাত্র ইউনিয়নের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। পিরোজপুরে বিভিন্ন রাজনৈতিক সভা-সমাবেশে তিনি নিয়মিত যোগ দিতেন। পাকিস্তানিদের শাসন ও শোষণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ছিল হেনার।

৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর দেয়া ভাষণের পর থেকেই পিরোজপুরের সকল স্তরের জনগণের মধ্যে অভূতপূর্ব জাগরণ শুরু হয়। ১০ মার্চ ছাত্র

ইউনিয়নের কর্মীরা বাঁশের লাঠি ও লোহার বল্লম হাতে নিয়ে মাথায় লালটুপি পরে মুক্তির আন্দোলনে প্রস্তুত হিসেবে মিছিল বের করে। মিছিলে অন্যান্য মেয়েদের সাথে রোকেয়া বেগম হেনা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

মার্চের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি আবেগে আপ্লুত হয়ে বলেন, 'মার্চের প্রতিটি দিনে আমাদের কোনো না কোনো কর্মসূচি ছিল। ২২ মার্চের বিভিন্ন সংগঠনের কর্মীরা ঘরে বসে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা তৈরি করে এবং ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়। ২৩ মার্চ প্রথম পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন তৎকালীন ছাত্রলীগের সভাপতি ওমর ফারুক। একই দিনে সারা পিরোজপুর সদরে সকল দোকানে উত্তোলন করা হয় প্রথম পতাকা।' নিজের বাড়িতেও স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন রোকেয়া।

ঢাকায় গণহত্যা শুরু হলে ২৫ মার্চ পরে পাকসেনাদের 'প্রতিরোধ প্রস্তুতি' হিসেবে পিরোজপুরে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। কার্যত এই প্রতিরোধ প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে পিরোজপুরে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হয়। পাকবাহিনীর অত্যাচার থেকে পিরোজপুর এলাকাকে রক্ষা করার জন্য ২৮ মার্চ ছেলেদের জন্য সশস্ত্র প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ছেলেদের পাশাপাশি একই সময়ে পিরোজপুর শহর ও পাশের গ্রামগুলো থেকে মেয়েদেরকে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য বাছাই করা হচ্ছিল। প্রথম ব্যাচে বাছাইকৃত ২০জনের মধ্যে রোকেয়া বেগম হেনা অন্তর্ভুক্ত হন। তখন মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য এই বাছাই প্রক্রিয়া এবং প্রশিক্ষণের সার্বিক নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মেজর জিয়াউদ্দিন, মুক্তিযোদ্ধা এমএ মান্নান, আলী হায়দার খানসহ অনেকে। একাত্তরের ২৯ মার্চ রোকেয়ার প্রশিক্ষণ শুরু হয়।

পিরোজপুর ওয়াপদা স্কুলের মাঠে (বর্তমান পানি উন্নয়ন বোর্ড) তাঁদের প্রশিক্ষণ হয়। প্রশিক্ষণের মধ্যে ছিল পিটি, প্যারেড, গ্রেনেড নিক্ষেপ, রাইফেল চালানো এবং বিভিন্ন বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহার। মুক্তিযোদ্ধা ফজলুল হক ও মুক্তিযোদ্ধা সফিউদ্দিন তাঁদের প্রশিক্ষণ দেন। আগ্নেয়াস্ত্রের পাশাপাশি তিনি নার্সিং প্রশিক্ষণও গ্রহণ করেন। নার্সিং প্রশিক্ষণ দেন ডা. শ্যামাচরণ সাহা এবং ডা. মমতাজ উদ্দিন। একমাস তাঁদের প্রশিক্ষণ ও মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি চলে। প্রশিক্ষণ শেষে সংগঠিত হতে থাকে মুক্তিযোদ্ধারা।

৪ মে ১৯৭১ পাকসেনারা পিরোজপুরে আসে। পাকবাহিনী হুলারহাট লঞ্চঘাটে নেমেই নির্বিচারে গুলি চালায় এবং বাড়িঘর ও দোকানে আগুন দেয়। ঐদিন পিরোজপুরের এসডিও ও এসপিওসহ বেশ কয়েকজন বাঙালি কর্মকর্তাকে বলেশ্বর নদীর ধারে হত্যা করে। মানুষ হতবাক হয়ে পড়ে এই বীভৎস দৃশ্য দেখে।

এদিকে মুক্তিযোদ্ধারা মাসব্যাপী পাকসেনাদের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ গড়ে তুলছিল, পাকসেনাদের ভারী অস্ত্রের কাছে তা কর্পুরের মতো হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল মুক্তিযোদ্ধারা। পিরোজপুরে থাকা নিরাপদ নয় ভেবে জুন মাসে

রোকেয়া বেগম হেনা তাঁর পরিবারের সাথে স্বরূপকাঠি চলে যান। স্বরূপকাঠি থেকেও তিনি নানাভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষার চেষ্টা করেন। ওই সময় ছালাম নামে এলাকায় পরিচিত এক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের সন্ধান পান। পরিবারের সকল বাধা উপেক্ষা করে হেনা ও তাঁর বোন শিরিন কমান্ডার ছালামের নিকট যান এবং ইতোপূর্বে তাঁদের মুক্তিযুদ্ধে যোগদান ও প্রশিক্ষণের বর্ণনা দেন। কমান্ডার ছালাম রোকেয়ার আগ্রহে খুশি হন এবং তাঁদের মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের অনুমতি দেন। ছালামের অনুমতি পেয়ে রোকেয়া বেগম হেনা নিয়মিত মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেন। মূলত ইনফরমার হিসেবে কাজ শুরু করেন হেনা। তিনি বিভিন্ন ছদ্মবেশ ধারণ করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, অস্ত্র গোলাবারুদ এক ক্যাম্প থেকে অন্য ক্যাম্পে আনা-নেয়ার কাজ করতেন। মাঝে মাঝে তিনি আহতদের সেবা-শুশ্রূষাও করেছেন। তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব অতিশয় গুরুত্বের সাথে পালন করতেন তিনি। দায়িত্ব পালনের জন্য কমান্ডার আঃ ছালাম বহুবার তাঁকে প্রশংসা করেছেন। হেনা পরে জানতে পারেন এই আঃ ছালামই ছিলেন সিরাজ শিকদার।

দেশের স্বাধীনতার পর পিরোজপুরে চলে আসেন হেনা। একদিকে লাশের গন্ধ, মৃত্যু, কান্না অন্যদিকে বিজয়ের আনন্দ! একাত্তরের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি আবেগে আপ্লুত হন। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন, 'আমরা মুক্তির জন্য যুদ্ধ করে স্বাধীনতা পেয়েছি। আমার চাওয়া পাওয়ার কিছু নেই। তবে এতটুকুই চাই যেন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শে বেড়ে ওঠে।'

১৯৭৪ সালে রোকেয়া পিটিআই পাশ করেন এবং পিরোজপুর সদরে একটি সরকারি প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৯৭৮ সালে ৪ আগস্ট কাউখালী থানার চিরাপাড়া ইউনিয়নের সুবিতপুর গ্রামের খলিলুর রহমানের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। বর্তমানে এক ছেলের মা। মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকায় তিনি নাম লেখানোর ব্যাপারে অতীতে কখনো আগ্রহ প্রকাশ করেন নি, বর্তমানেও করেন না। তবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পেরেছিলেন বলে গর্ববোধ করেন।

আঞ্জুমান আরা বেগম
(ভোলাহাট)

মুক্তিযোদ্ধা মেহেরুন্নাহারের কাছ থেকে আমি আঞ্জুমান আরা বেগমের কথা জানতে পাই। বিকালে তাঁর বাড়ির উদ্দেশে রওনা হয়ে যাই ভোলাহাট থানার ঝাউবন গ্রামে। মুক্তিযোদ্ধা আঞ্জুমান আরার গ্রামটি আমবাগানে শোভিত। পড়ন্ত বেলায় দেখা হয় তাঁর সাথে। দেখতে গম্ভীর প্রকৃতির মনে হলেও অত্যন্ত মিশুক ও আন্তরিক তিনি।

তাঁর জন্ম ১৯৫০ সালের ১ সেপ্টেম্বর চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার মসজিদপাড়া এলাকায়। তাঁর বাবা মৌলভী মোঃ আইনউদ্দিন মিঞা ছিলেন একজন প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক এবং মা হামিদা বেগম গৃহিণী। তিন ভাই ও দুইবোনের মধ্যে আঞ্জুমান আরা দ্বিতীয়।

একাত্তরের এপ্রিল মাসের শেষদিকে পাকবাহিনীর অত্যাচার ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। তারা শকুনের মতো ঘিরে ফেলে বাংলার গ্রাম-গ্রামান্তর। জ্বালিয়ে দেয় গ্রামের পর গ্রাম। নারী নির্যাতন ও লুটের রাজত্ব কায়েম করে পাকবাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকারেরা। সারা দেশের মানুষ তাদের অত্যাচার ও নির্যাতনে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। গ্রামবাসীরা পালাক্রমে তাদের গ্রাম পাহারা দেয়। এসব দেখে প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন আঞ্জুমান আরা ।

পাকবাহিনী ভোলাহাটে স্থায়ীভাবে ঘাঁটি স্থাপন করতে পারে নি, কারণ ভোলাহাট থানার তিন দিকে ভারত এবং পূর্বদিক মহানন্দার শাখানদী দ্বারা বেষ্টিত। ভোলাহাটের পূর্বপাশে গোমস্তাপুর থানা। মে মাসের প্রথম দিকে এখানে পাকবাহিনী স্থায়ীভাবে ঘাঁটি স্থাপন করে। পাকবাহিনী গোমস্তাপুর থেকে মাঝেমধ্যেই ভোলাহাটের বিভিন্ন গ্রামে আক্রমণ চালায় এবং নির্বিচারে গুলি করে, জ্বালিয়ে দেয় ঘরবাড়ি। পাকবাহিনীর এরকম অত্যাচার ও নির্যাতনে অতিষ্ঠ হন আঞ্জুমান আরা। তিনি নানাভাবে সুযোগ খুঁজতে থাকেন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য।

ভোলাহাট থানার গিলাবাড়িতে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প ও অস্থায়ী হাসপাতাল ছিল। আগস্ট মাসের দিকে এই অস্থায়ী হাসপাতালে আসতে থাকে আহত

মুক্তিযোদ্ধারা। হাসপাতালে চাহিদার তুলনায় ডাক্তার, নার্স ও চিকিৎসা ব্যবস্থা ছিল অপ্রতুল। সীমিত সংখ্যক ডাক্তার ও নার্সের পক্ষে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের যথাযথ সেবা দেয়া সম্ভব হচ্ছিল না। ওই সময় হাসপাতালে চিকিৎসা কাজে সহযোগিতার জন্য এলাকায় শিক্ষিত মেয়েদের খোঁজ করা হচ্ছিল।

আঞ্জুমান আরা তাঁর বান্ধবী মুক্তিযোদ্ধা মেহেরুন্নাহার ও সামসুন্নাহারের সহযোগিতায় মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার নিজামউদ্দিন ও হাফিজুর রহমান হাসনুর নিকট যান এবং মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। হাফিজুর রহমান আঞ্জুমানের আগ্রহ দেখে মুগ্ধ হন এবং অস্থায়ী হাসপাতালে নার্স হিসেবে যোগদানের জন্য অনুমতি দেন।

নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে নার্স হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন আঞ্জুমান আরা। তিন সপ্তাহের নার্সিং প্রশিক্ষণ হয় তাঁর। নার্সিং প্রশিক্ষণ দেন ডাক্তার জসি ও ডাক্তার বিপেন। মূলত তাঁদের নার্সিং প্রশিক্ষণ হয় হাতে-কলমে। নার্সিং প্রশিক্ষণের পাশাপাশি আগ্নেয়াস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণও গ্রহণ করেন তিনি। আগ্নেয়াস্ত্রের মধ্যে ছিল গ্রেনেড ও রাইফেল অন্যতম। কমান্ডার হাফিজউদ্দিন হাসনু তাঁদের আগ্নেয়াস্ত্রের প্রশিক্ষণ দেন।

নার্স হিসেবে তিনি যে ডাক্তারদের সাথে কাজ করেন তাদের মধ্যে ডাক্তার বিপেন, ডাক্তার জসি ও ডাক্তার ইয়াসিন অন্যতম। আহত মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষতস্থান পরিষ্কার করা, ব্যান্ডেজ করা, ইনজেকশন পুশ করা, ঠিকমতো ঔষধ খাওয়ানো ছিল তাঁর নিয়মিত কাজ। এছাড়া ছোট ছোট অপারেশনের সময় তিনি ডাক্তাদের সহযোগিতা করতেন। আহতদের অবস্থা বেশি খারাপ হলে ডাক্তারদের তত্ত্বাবধানে তাঁদেরকে দ্রুত মালদহ সরকারি হাসপাতালে পাঠানো হতো। দেশ স্বাধীনের আগে পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন এবং প্রশংসিত হন।

পাকসেনাদের অমানবিক নির্যাতনের একটা স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'গোমস্তাপুর থানা স্বাধীন হওয়ার পরের দিন আমরা কয়েকজন নার্স, ডাক্তার ও সশস্ত্রযোদ্ধা একসাথে গোমস্তাপুর থানার রহনপুরে পাকিস্তানিদের ক্যাম্পে যাই। ক্যাম্পের সাথেই পাকিস্তানিদের বাংকার ছিল। ওই বাংকারের ভেতরে এক করুণ দৃশ্য দেখতে পাই আমরা। আমার বুকের ভেতরটা দুমড়ে মুচড়ে যায়। বাংকারের মধ্যে এখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে মেয়েদের চুলের বেণি, চুলের গোছা, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন পেটিকোট ব্লাউজ। আমাদের বুঝতে কষ্ট হয় নি নরপশুরা মেয়েদের বাংকারের ভেতরেও নির্যাতন চালিয়েছে। আজও সে দৃশ্য মনে হলে আঁতকে উঠি আমি। হয়তো, আজও কান পাতলে ওই মেয়েদের আর্তনাদ শুনতে পাই, শুনতে পাই নিজেদের প্রাণ ভিক্ষার আকুতি। কিন্তু পশুরদলের হাত থেকে রক্ষা পায় নি মেয়েরা।'

স্বাধীনতার পরে ১ আগস্ট ১৯৭৯ সালে ভোলাহাট থানার ঝাউবন গ্রামের আলহাজ্ব মুজিবুর রহমানের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন আঞ্জুমান আরা। তার স্বামী প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। এক ছেলে ও তিন মেয়ের জননী তিনি।

আঞ্জুমান আরা আবেগে আপ্লুত হয়ে আরো বলেন, 'যাদের জীবনের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেলাম, তাঁদের ত্যাগের কী মূল্যায়ন হলো? আমরা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাই।'

হাজারো স্মৃতি এবং বুকের ভেতর চাপা আর্তনাদ নিয়ে বেঁচে আছেন আঞ্জুমান আরা। তিনি মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস এ প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের জানানোর অনুরোধ জানিয়েছেন।

মেহেরুন্নেছা মিরা
(বাগেরহাট)

পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর থানার ষোলসাত রঘুনাথপুর গ্রামের দফাদার বাড়ির একটি দরিদ্র মুসলিম পরিবারে মেহেরুন্নেছা মিরা জন্মগ্রহণ করেন। বাবা তাছেনউদ্দিন শেখ এবং মা হাজেরা বেগম। কবে কখন তাঁর জন্ম তা তিনি বা তাঁর আত্মীয়স্বজন সঠিকভাবে বলতে পারেন নি। তিনি জানান ১৯৭১ সালে তাঁর বয়স ছিল ২০-২১ বছর। দুই বোনের মধ্যে তিনি বড়। বাবার আর্থিক দীনতা এবং পারিপার্শ্বিকতার অসহযোগিতার কারণে তিনি খুব একটা লেখাপড়া করতে পারেন নি। ছেলেবেলা থেকেই দু'মুঠো ভাতের জন্য বাবার সাথে সংসারের বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করতে হয়েছে তাঁকে। জীবিকার প্রয়োজনে একসময়ে তিনি বাগেরহাটে চলে যান। মিরা ছোটবেলা থেকেই ভালো গান গাইতে পারতেন। তাই যাত্রাদলে কাজ করার সুযোগ পান। বিভিন্ন যাত্রাদল বদলের পর একসময় জয়দুর্গা অপেরায় যোগ দেন। যাত্রাদলে অভিনয় ও গান করতেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর সময়ে জয়দুর্গা অপেরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা শহরে কর্মরত ছিল।

মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই তিনি আবার বাগেরহাটে ফিরে আসেন। পাকবাহিনীর অত্যাচারে শরণার্থী হিসেবে ভারতে চলে যাচ্ছে হাজার হাজার মানুষ। এদিকে পাকবাহিনী ও তাদের এদেশের দোসর রাজাকার আলবদররা নির্বিচারে খুন, ধর্ষণ, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়ার উন্মাদনায় মত্ত। একদিকে লাশের গন্ধ অন্যদিকে লুটপাট ধর্ষণের হোলি খেলা যুবতী মিরাকে ভাবিয়ে তোলে। শিল্পীর কোমল মন একসময় প্রতিশোধের নেশায় বারুদে পরিণত হয়। মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য সুযোগ খুঁজতে থাকেন তিনি।

বিশ্বস্তসূত্রে খবর পেয়ে যাত্রাদলের এক সহকর্মীকে নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের উদ্দেশ্যে বাগেরহাট থেকে ৭ কিলোমিটার দূরে দেপাড়া গ্রামে যান মিরা। তখন সেখানে অবস্থান করছিলেন ক্যাপ্টেন তাজুল ইসলাম। মিরা ক্যাপ্টেন তাজুল ইসলামের কাছে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। মিরার কথাবার্তা

শুনে ও আগ্রহে মুগ্ধ হয়ে ক্যাপ্টেন তাকে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের অনুমতি দেন। ক্যাপ্টেন তাজুল ইসলামের অনুমতি পেয়ে মিরা ৯ নং সেক্টরের আওতায় মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন।

রাইফেল, মেশিনগান চালানো, গ্রেনেড ছোড়া সহ বিভিন্ন ধরনের বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহারের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন তিনি। প্রথমে ক্যাপ্টেন তাজুল ইসলামের নিকট সমরাস্ত্র প্রশিক্ষণ নেন মিরা। একাত্তরের জুলাই মাসে রফিকুল ইসলাম খোকনের দলে যোগ দেন এবং বিভিন্ন আগ্নেয়াস্ত্র বিষয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ নেন।

যুদ্ধ চলাকালে বিভিন্ন ছদ্মবেশ ধারণ করে তথ্য সংগ্রহ করেন। তিনি কখনো কুলবধূ, কখনো ভিখারিনী, কখনোবা সরাসরি যোদ্ধা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। রফিকুল ইসলাম খোকনের নেতৃত্বে ৯নং সেক্টরের আওতায় বাগেরহাট জেলার পার্শ্ববর্তী এলাকা তালেশ্বর, ভাষার হাট, বয়াসিং ও নাজীরপুর থানার রঘুনাথপুরের যুদ্ধসহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে তিনি সরাসরি অংশগ্রহণ করেন এবং দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের জন্য কমান্ডারের নিকট অত্যন্ত বিশ্বস্ত ছিলেন মিরা। বিশ্বস্ততার জন্য ক্যাম্পের গোপনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তাঁকে দেয়া হতো। দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি দক্ষতার সাথে তাঁর স্বীয় দায়িত্ব পালন করেন এবং প্রশংসিত হন।

দেশ স্বাধীন হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধারা ঘরে ফিরেছে। তাঁরা সোনার ছেলে; দেশের সম্পদ কিন্তু দেশ স্বাধীনের পরে ? মিরা মেয়ে মানুষ, গরিব, তাঁর বাবার অর্থকড়ি নেই। তারপরে গেছে মুক্তিযুদ্ধে। সমাজ নারী মুক্তিযোদ্ধা বলতে বোঝে বীরাঙ্গনাদের। এক শ্রেণীর সমাজপতির এ রকম দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজের বোঝায় পরিণত হয় মিরা। দেশ স্বাধীন পর্যন্ত মিরাও ছিল দেশের সম্পদ। একদিকে সমাজের তিরস্কার অন্যদিকে দারিদ্র্য সব মিলে দুর্বিষহ হয়ে ওঠে মিরার জীবন।

১৯৭৩ সালের ১০ জুলাই বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ থানা সদরে আব্দুল হাইকে বিয়ে করেন মুক্তিযোদ্ধা মিরা। বিয়ের পরে বিভিন্ন সময়ে কথোপকথনে তাঁর স্বামী তাকে অকথ্য ভাষায় গালি দিত। মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিল, পুরুষ মানুষের সাথে ক্যাম্পে থেকেছে— এটাই মিরার বড় অপরাধ! সময় গড়িয়ে যায়, মিরার কোল জুড়ে আসে দুই ছেলে দুই মেয়ে। এক সময় তাঁর স্বামী তাঁকে ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। পরমুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে মিরা।

পাকিস্তানিদের আগ্রাসন থেকে মুক্তি পেলেও দারিদ্র্যের কষাঘাত থেকে মুক্তি পান নি মিরা। এখনো তাঁকে যুদ্ধ করতে হচ্ছে দারিদ্র্যের সাথে। সময় গড়িয়ে স্বাধীনতা বত্রিশে পা রেখেছে; সেই সাথে তাঁর দুই ছেলে দুই মেয়ে বড় হয়েছে, তাদের বিয়ে দিয়েছে। অর্থাভাবে ছেলেমেয়েদের খুব একটা লেখাপড়া শিখাতে পারেন নি। ছেলে-মেয়েরা যার যার সংসার করে। মিরার একটি ছোট চায়ের দোকান আছে; এরই সাথে আছে একটি লাকড়ির ব্যবসা। সেখান থেকে যে সামান্য আয় হয়,

তা দিয়ে সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে তাঁকে। এক মাস চললে পরের মাসে দেনা করতে হয়।

চাপাকান্না জড়িত কণ্ঠে বললেন, 'যুদ্ধ করেছি কিন্তু কিছু পাই নি। অর্ধাহারে-অনাহারে থাকি, আফসোস নেই। খারাপ লাগে নারী মুক্তিযোদ্ধা বলতে অনেকে খারাপ মেয়েমানুষ হিসেবে মনে করে। পুরুষের পাশাপাশি আমরাও যে সশস্ত্র যুদ্ধ করেছি, অবদান রেখেছি স্বাধীনতার জন্য কিন্তু তার যথাযথ স্বীকৃতি নেই। সকলের নিকট আবেদন— নারী মুক্তিযোদ্ধা বিশেষ করে যারা গ্রামে অবহেলা আর অনাদরে পড়ে আছে তাঁরা যেন যথাযথ মর্যাদা, স্বীকৃতি ও সম্মান পায়।'

জাহানারা বেগম
(রংপুর)

লোকমুখে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জনকণ্ঠের সাংবাদিক বন্ধু মানিক সরকারের সহযোগিতায় অনেক খোঁজাখুঁজির পরে বেলা বারটার দিকে জাহানারা বেগমের বাসায় পৌছাই। অত্যন্ত আন্তরিক পরিবেশে কথা হয় অসুস্থ মুক্তিযোদ্ধা জাহানারা বেগমের সাথে। জাহানারা বেগমের জন্ম রাজশাহী জেলার ঘোড়ামারা থানার দরগাপাড়ায়। বাবা রফিক উদ্দিন ও মা আঞ্জুমান আরা বেগম। দুই ভাই ও চার বোনের মধ্যে তিনি চতুর্থ। রাজশাহী মিশনারি স্কুল থেকেই লেখাপড়া শুরু করেন তিনি। অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার সময় মাত্র তের বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয় নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানার নবতমপুর গ্রামের এ.কে.এম হাফিজউদ্দিনের সঙ্গে। হাফিজউদ্দিন চাকুরির সুবাদে রাজশাহী থাকতেন। বিয়ের পরে জাহানারা বেগম রাজশাহী মাতৃসদনে হেল্‌থ ভিজিটর হিসেবে কাজ করতেন।

একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বামীর সাথে রংপুরে ছিলেন জাহানারা বেগম। তাদের বাসাটা ছিল রংপুরের বিহারি এলাকায়। মার্চের পুরো সময়টা রংপুরের অবস্থা ছিল থমথমে। ২৩ মার্চ রংপুর শহরে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের পরে বিহারিরা ভেতরে ভেতরে বেপরোয়া হয়ে ওঠে। ২৫ মার্চ রাতে ঢাকায় গণহত্যা শুরু হলে রংপুরে ব্যাপকভাবে এর প্রভাব পড়ে। পাকবাহিনীর সাথে অবাঙালি বিহারিরাও বাঙালিদের ওপর নির্যাতন শুরু করে।

পাকিস্তানিদের দুঃশাসন ও নিষ্ঠুর নির্যাতনের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ও প্রতিশোধের জন্য জাহানারা বেগম তাঁর স্বামীর সাথে পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়াতে চলে যান। পঞ্চগড়ে থাকার সুবিধামতো জায়গা না থাকায় তাঁরা প্রথমে ভারতের পশ্চিম দিনাজপুরে চলে যান। পরে তাঁর স্বামীর এক বন্ধুর সহযোগিতায় জলপাইগুড়ি জেলায় পানবাড়ি ক্যাম্পে যান জাহানারা। ৬ নং সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার জনাব এম, কে বাশারের অনুমতি নিয়ে পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে জাহানারা ভারতের জলপাইগুড়ি জেলার পানবাড়ি ক্যাম্পে স্বাস্থ্য সহকারী হিসেবে কাজে যোগ দেন। পানবাড়ি অস্থায়ী

হাসপাতালে নার্সিংয়ের পাশাপাশি তিনি সশস্ত্র প্রশিক্ষণও গ্রহণ করেন। অস্ত্রের মধ্যে গ্রেনেড, থ্রি নট থ্রি রাইফেল ও বিভিন্ন ধরনের বিস্ফোরকদ্রব্য ব্যবহার অন্যতম। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি কাজ শুরু করেন পানবাড়ি ক্যাম্পের অস্থায়ী হাসপাতালে। অসংখ্য আহত যোদ্ধাদের সেবা করেছেন তিনি। আহতের ক্ষতস্থান পরিষ্কার করা, ইনজেকশন পুশ করা, নিয়মিত ঔষধ খাওয়ানো ছাড়াও অপারেশনের সময় ডাক্তারদের সহযোগিতা করা ছিল জাহানারার মূল কাজ। আহতের অবস্থা বেশি খারাপ হলে জলপাইগুড়ি সদর সরকারি হাসপাতালে পাঠানো হতো। স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা-শুশ্রূষা করেন এবং প্রশংসিত হন।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে মন্তব্য করতে বললে তিনি জানান— আমরা কখনোই ভাবি নি যে, এত দ্রুত দেশ স্বাধীন হবে। আহত যোদ্ধাদের স্মৃতি মনে পড়তেই এখনো শিউরে উঠি আমি। কী নিষ্ঠুর নির্যাতনের শিকার হয়েছে মুক্তিযোদ্ধারা! দেশ মাতৃকার মুক্তির জন্য তাঁরা নিজের জীবনকে বাজি রেখে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলেন। শত্রুর মোকাবেলা করতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়েছেন অথচ যে দৃঢ় প্রত্যয় তাঁদের মধ্যে লক্ষ করা গেছে, তা জীবনে ভুলব না।

দেশের স্বাধীনতার পরে রংপুরে ফিরে আসেন জাহানারা। এরই মধ্যে তাঁর স্বামী মারা যান। তিন ছেলে ও তিন মেয়ের জননী তিনি। তিনি বর্তমানে অসুস্থ। ছেলে-মেয়েরা বেকার। সংসারে আয় নেই বললেই চলে। আর্থিকভাবে তিনি এখন খুবই বিপন্ন। রোগ, শোক এবং আর্থিক দীনতায় জরাজীর্ণ হয়েও, এখনো মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকে জীবনের শ্রেষ্ঠ গৌরব মনে করেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য পরিবারের সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করে।

সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য জীবনবাজি রেখে রণাঙ্গনে নেমেছিলেন যে বীর নারী তার জীবন আজ মুক্তিহীন। দেশ ও জাতির কাছে তিনি চান একটি মুক্ত সমাজ, স্বাধীনতার চেতনায় ভাস্বর একটি সুন্দর স্বচ্ছন্দ সমাজ।

মাহমুদা খানম
(নওয়াপাড়া, যশোর)

মুক্তিযোদ্ধা মাহমুদা খানমের জন্ম লক্ষ্মীপুর জেলার রায়পুর থানার কেয়ারপুর গ্রামের এক দরিদ্র মুসলিম পরিবারে ১৯৪০ সালে। তাঁর বাবা আশাদ আলী মোল্লা কৃষক এবং মা রোকেয়া বেগম গৃহিণী। সাত ভাইবোনের মধ্যে মাহমুদা তৃতীয়। তিনি ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত হাসিখুশি ও পরিশ্রমী প্রকৃতির নারী। কৈশোর থেকেই লেখাপড়া ছেড়ে তিনি পিতার সংসারে বিভিন্ন উপার্জন কর্মে সহযোগিতা করতেন। হাঁস-মুরগি প্রতিপালন, তরিতরকারির আবাদ, বাবার সাথে কৃষিকাজ করা ছিল তাঁর নিয়মিত কাজ। আত্মীয়স্বজনের সহযোগিতায় যশোর জেলার নওয়াপাড়া ইউনিয়নের মধুগ্রামে খোরশেদ আলীর সাথে তাঁর বিয়ে হয় ১৯৫৫ সালে। স্বামী খোরশেদ আলী পারিবারিকভাবেই অত্যন্ত গরিব ছিলেন। নিয়মিত দিনমজুরি দিয়ে সংসার চালাতে হতো তাঁকে। মাহমুদা খানম স্বামীর সংসারে এসে স্বামীকে বিভিন্নভাবে অর্থনৈতিক সহযোগিতা করতেন। তিনি নিজের কাজ ছাড়াও এলাকার অন্য পরিবারের কাঁথা সেলাই, ধানভানার কাজ করতেন। এছাড়া খেজুরের পাটি বুনে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করতেন। এ কারণে তিনি তাঁর এলাকার অনেক গ্রাম চিনতেন। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ সম্পর্কে তাঁর নিকট জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন— যশোর শহর থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে বুড়িভৈরব নদীর পাশে, যশোর ক্যান্টনমেন্টের পিছনের দিকে তাঁদের মধুগ্রামটি অবস্থিত। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে গ্রামটির অবস্থান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর-পরই দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য প্রচুর লোক এই এলাকায় অবস্থান নেয়া শুরু করে। কারণ গ্রামটি নদী দ্বারা বিচ্ছিন্ন এবং অনেকটা নিরিবিলি। এ সময়ে মাহমুদা ছয় সন্তানের জননী। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি যশোর এলাকায় পাকবাহিনী নির্বিচারে হত্যা করে নিরীহ বাঙালিদের। তখন বিভিন্ন এলাকা থেকে লোকজন মধুগ্রামে এসে আশ্রয় নেয়। তাদের নিকট থেকে পাকবাহিনীর ভয়াবহ নির্যাতনের কথা জানতে পারেন মাহমুদা। দিনে দিনে পাকবাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার-আলবদরদের অত্যাচার

বাড়তে থাকে। মাহমুদারও ক্ষোভ এবং ঘৃণা বাড়তে থাকে পাকবাহিনীর প্রতি। এক সময়ে সমস্ত পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও ঘৃণা মাহমুদাকে প্রতিবাদী করে তোলে। সুযোগ খুঁজতে থাকেন মাহমুদা ও তাঁর স্বামী মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য। কিন্তু মে মাস পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের তেমন সুযোগ পান নি তাঁরা।

মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে রবিউল আলম ওরফে গাজী এবং আবুল কালাম ওরফে কালু নামে দুইজন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার এবং কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা দুপুরবেলা মাহমুদার বাড়িতে আসেন। তাঁরা দুপুরে তাঁদের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করেন। তাদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে মাহমুদার স্বামী প্রথমে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন। মুক্তিযোদ্ধারা মে মাসের শেষদিকে মাহমুদার বাড়িতে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প স্থাপন করেন। নিজ বাড়িতে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প স্থাপিত হলে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগ হয় মাহমুদার। মাহমুদা খানম জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। ক্যাম্পে তিনি সশস্ত্র প্রশিক্ষণও গ্রহণ করেন। মাহমুদাকে প্রশিক্ষণ দেন তাঁর স্বামী খোরশেদ আলী। এছাড়া কমান্ডার রবিউল আলম ও কমান্ডার কালামের নিকট থেকেও তিনি প্রশিক্ষণ পান ছদ্মবেশ ধারণ সম্পর্কে। তিনি যে সমস্ত আগ্নেয়াস্ত্রের প্রশিক্ষণ পান তার মধ্যে গ্রেনেড ও রাইফেল অন্যতম। তবে রাইফেলের চেয়ে তাঁর নিকট গ্রেনেড ছোড়া সহজ ছিল। এই অস্ত্রের প্রশিক্ষণটি তাঁকে যে-কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য দেয়া হয়েছিল।

ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধাদের রান্না করাসহ তাদের খাদ্য সংগ্রহ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন তিনি। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিনিধি হিসাবে এলাকার প্রতিটি পাড়ায়, বাড়ি বাড়ি ঘুরে খাদ্য সংগ্রহ এবং ইনফর্মার হিসেবে কাজ করতেন। তিনি কখনো ভিক্ষুক, কখনো কুলবধূ, কখনো পাগলিনী, কখনো বা ফেরিওয়ালা হিসেবে তথ্য সংগ্রহ, অস্ত্র ও গোলাবারুদ আনা-নেয়ার কাজ করেছেন। তাঁর বিচক্ষণতা ও দক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে কমান্ডার তাঁকে ক্যাম্পের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিতেন। কমান্ডারের নির্দেশে বিভিন্ন সময় ক্যাম্পে অস্ত্রশস্ত্র রক্ষণাবেক্ষণ এবং যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহের দায়িত্বও অত্যন্ত নিখুঁতভাবে পালন করেছেন তিনি। দেশ স্বাধীনের আগে পর্যন্ত তিনি তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব অতিশয় বিচক্ষণতার সাথে পালন করেছেন।

যুদ্ধ শেষ হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধারা ঘরে ফিরেছেন। মাহমুদাও আবার সংসার জীবন শুরু করেছেন। পাকিস্তানি আগ্রাসন ও নির্যাতন থেকে মুক্তি পেয়েছেন, কিন্তু মুক্তি পান নি দারিদ্র্য থেকে। দারিদ্র্যের সাথে আজও লড়াই করতে হচ্ছে মাহমুদাকে।

বর্তমানে তাঁর ৫ ছেলে ও ৫ মেয়ে। ছেলেমেয়েদের সবার বিয়ে হয়েছে। ছেলেরা পৃথক সংসার করছেন। তিনি তাঁর স্বামীকে নিয়ে অভাবের সংসারে হাবুডুবু খাচ্ছেন। তাঁর স্বামী বৃদ্ধ, কাজ করার শক্তি নাই বললেই চলে। বাড়ির সামনে একটি মুদি দোকান আছে তাঁর স্বামীর। মুদি দোকান থেকে যে সামান্য আয় হয় তা দিয়ে কোনোমতে চলে মাহমুদার সংসার।

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পেরেছেন বলে তিনি গর্বিত। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য সমাজ তাঁকে ভালো চোখে দেখে নি। এজন্য সমাজের প্রতি ক্ষোভ নেই তাঁর। এখন তাঁর মনে একটিই আশা মুক্তিযোদ্ধারা যেন মর্যাদা নিয়ে বাঁচতে পারে এবং প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা যেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শে উজ্জীবিত হয়।

মোসাম্মৎ মেহেরুন্নাহার
(ভোলাহাট)

'পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী বাঙালিদের হাতে সহজে ক্ষমতা ছাড়বে না'— এ সহজ কথাটা বুঝতে পেরেছিলেন দশম শ্রেণীর ছাত্রী মেহেরুন্নাহার। পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর শাসন ও শোষণ সম্পর্কে পারিবারিকভাবে ও শিক্ষকদের মাধ্যমে সচেতন হয়েছিলেন স্কুল-পড়ুয়া মেহেরুন।

মেহেরুন্নাহারের সন্ধান পাই সাপ্তাহিক মুক্তিবার্তা পত্রিকা থেকে। সাপ্তাহিক মুক্তিবার্তা পত্রিকাটি প্রকাশিত হতো মুক্তিযুদ্ধ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল ও বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ থেকে। এই পত্রিকায় প্রকাশিত এক তথ্যের ভিত্তিতে মুক্তিযোদ্ধা মেহেরুন্নাহারের সন্ধানে রওনা হই ভোলাহাটের উদ্দেশে। ভোলাহাট বাংলাদেশের পশ্চাৎপদ একটি জনপদ। জনপদটি পশ্চাৎপদ হলেও, আম বাগানের ছায়াঘন নয়নাভিরাম দৃশ্য যে-কোনো পর্যটককে মুগ্ধ করে। মাইলের পর মাইল আমের বাগান যেন মাতৃছায়া দিয়ে রেখেছে সমগ্র ভোলাহাটকে। বেলা দশটার দিকে দেখা হয় মেহেরুন্নাহারের সাথে।

মেহেরুন্নাহারের জন্ম ১৯৫৭ সালের ৩ ডিসেম্বর চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ভোলাহাট থানার বজরাটেক গ্রামে। তাঁর বাবা মোঃ সাইফুদ্দিন শেখ ছিলেন ক্ষুদ্রব্যবসায়ী এবং মা মোছাঃ মাহিজান বেগম গৃহিণী। ছয় ভাই ও চার বোন তাঁরা। ছোটবেলা থেকে চটপটে এবং লেখাপড়ায় ভালো ছিলেন বলে পরিবারের সবাই তাকে ভালবাসতেন।

যুদ্ধ শুরুতেই পাক-মিলিটারি শকুনের মতো ঘিরে ফেলে বাংলার প্রায় সমস্ত জনপদ। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেয় পাকবাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকারেরা। নির্যাতন চালায় নারীদের ওপর। সারাদেশের মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। গ্রামবাসীরা পালাক্রমে পাহারা দেয় তাদের গ্রাম। এসব দেখে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে মেহেরুন্নাহার।

পাকসেনারা স্থায়ীভাবে ঘাঁটি করতে পারে নি ভোলাহাটে, কারণ থানাটি প্রথমত ভারতের কোঁলঘেসা এবং দ্বিতীয়ত মহানন্দা নদী ও তার একটি শাখাবেষ্টিত। উল্লেখ

থাকে, ভোলাহাটের পূর্বপাশেই গোমস্তাপুর থানা। সেখান থেকে পাকসেনারা মাঝেমধ্যেই হত্যা, বাড়িঘর জ্বালানো ও নির্যাতনের কাজটি করেছে ভোলাহাটে। পাকসেনা ও তাদের এদেশীয় দোসরদের নির্যাতন দেখে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য নানাভাবে সুযোগ খুঁজতে থাকেন প্রতিবাদী মেহেরুন।

ভোলাহাট থানার গিলাবাড়িতে ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প ও অস্থায়ী হাসপাতাল। আগস্ট মাসের দিকে এই অস্থায়ী হাসপাতালে ভর্তি হতে থাকে অগণিত আহত যোদ্ধারা। হাসপাতালে চাহিদার তুলনায় ডাক্তার, নার্স ও চিকিৎসার সামগ্রী ছিল অপ্রতুল। সীমিত সংখ্যক ডাক্তার ও নার্সের পক্ষে অগণিত আহতদের সামলানো ছিল অত্যন্ত কষ্টকর। ওই সময় অস্থায়ী হাসপাতালে চিকিৎসা কাজে সহযোগিতার জন্য এলাকায় শিক্ষিত মেয়েদের খোঁজ করা হচ্ছিল। মেহেরুন তাঁর মেজ দুলাভাইয়ের সহযোগিতায় মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য ৭নং সেক্টরের, ৩নং সাব-সেক্টর কমান্ডারের অধীনে ক্যাম্প কমান্ডার হাফিজউদ্দিন হাসনুর সঙ্গে দেখা করেন। কমান্ডার হাসনু মেহেরুনের আগ্রহে মুগ্ধ হন এবং বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে তাঁকে মুক্তিযোদ্ধা নার্স হিসেবে যোগ দিতে বলেন। কমান্ডারের নির্দেশে নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন মেহেরুন্নাহার।

মেহেরুনের প্রশিক্ষণ হয় বাংলাদেশের গিলাবাড়ি ও ভারতের মালদহ জেলার আদমপুর ক্যাম্পে। সেবিকা হিসেবে তিনি ২১ দিনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। মূলত তাঁদের এই নার্সিং প্রশিক্ষণ হয় হাতে-কলমে। ডাক্তার জসি ও ডাক্তার বিপেন তাঁদের নার্সিং প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষক ছিলেন। নার্সিং প্রশিক্ষণের পাশাপাশি আগ্নেয়াস্ত্রেরও প্রশিক্ষণ দেয়া হয় তাঁকে। আগ্নেয়াস্ত্রের মধ্যে গ্রেনেড ও বিভিন্ন ধরনের বিস্ফোরক দ্রব্য ছিল অন্যতম। নিজামউদ্দিন নেজা, হাফিজউদ্দিন হাসনু তাঁদের এই আগ্নেয়াস্ত্রের প্রশিক্ষণ দেন।

নার্স হিসেবে তিনি যে-সমস্ত ডাক্তারদের সাথে কাজ করেন তাদের মধ্যে ডাক্তার জসি, ডাক্তার বিপেন ও ডাক্তার ইয়াসিন অন্যতম। আহত মুক্তিযোদ্ধার ক্ষতস্থান ব্যান্ডেজ করা, ইনজেকশন পুশ করা, ঠিকমতো ঔষধ খাওয়ানোর কাজ করতেন তিনি। আহত মুক্তিযোদ্ধার অবস্থা খারাপ হলে ডাক্তারদের তত্ত্বাবধানে জরুরি ভিত্তিতে মালদহ সরকারি হাসপাতালে পাঠানো হতো। দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি তাঁর দায়িত্ব অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে পালন করেন এবং প্রশংসিত হন।

গোমস্তাপুর থানা মুক্ত হওয়ার পর সহযোদ্ধাদের সাথে রণাঙ্গন পরিদর্শনে যান মেহেরুননেসা। রহনপুর রণাঙ্গনে বাংকারের মধ্যে নারী নির্যাতনের ভয়ঙ্কর আলামতের দৃশ্য আজও মেহেরুন্নাহারের দু'চোখকে সিক্ত করে তোলে। বাংকারের মধ্যে নারীর ইজ্জতের ছিন্নভিন্ন ধর্ষণের নীরব সাক্ষী ছেঁড়া ব্লাউজ, চুলের বেণি, রক্তাক্ত কাপড়, কেটে ফেলা অঙ্গ দেখে নিজের অবদানকে মেহেরুন্নাহারের কাছে তুচ্ছ ঠেকেছিল, তাঁর মনে হয়েছিল এরকম হাজার হাজার নাম না জানা মেয়ের ত্যাগের

ফলেই অর্জিত হয়েছে আমাদের স্বাধীনতা। এঁরাই মুক্তিসংগ্রামের শ্রেষ্ঠতম ত্যাগী। কেবল অসাম্প্রদায়িক, রাজাকার মুক্ত বাংলাদেশের রূপায়ণের মধ্য দিয়েই শুধতে হবে লাখো মানুষের ত্যাগের ঋণ।

তিনি কান্নাজড়িত কণ্ঠে আরো বলেন, 'ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্ত এবং আড়াই লক্ষ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে অর্জিত এই স্বাধীন সোনার বাংলাদেশ। কিন্তু যাদের ইজ্জতের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেলাম, তাদের ত্যাগ এবং ইচ্ছার কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে ? সেই সমস্ত অত্যাচারী তো আবার পুনর্বাসিত হলো। ক্ষমতা পেল কিন্তু যে মা-বোনেরা ইজ্জত দিল, তাঁরা কী পেল ?'

দেশ স্বাধীন হয়েছে, পুরুষ মুক্তিযোদ্ধারা ঘরে ফিরেছে বীরত্বের সাথে। তাঁরা সোনার ছেলে, দেশের সম্পদ। আর নারী মুক্তিযোদ্ধাদের ঘরে ঠাঁই মেলা কষ্টকর। এমনিতে মেয়েমানুষ তার উপর গিয়েছি মুক্তিযুদ্ধে; মান-সম্মান সব গেছে। পুরুষদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে শতগঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে নারীযোদ্ধাদের। আর যারা ইজ্জত দিয়েছেন, তারা রাষ্ট্রীয়ভাবে বীরাঙ্গনা উপাধি পেলেও সমাজ তাঁদের দিয়েছে ধিক্কার। শত অপমান গ্লানি আর ধিক্কার নিয়ে বেঁচে আছেন তাঁরা। কথাগুলো অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বললেন মুক্তিযোদ্ধা মেহেরুন্নাহার। তবুও গর্বিত মেহেরুন মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করতে পেরে।

১৯৭৩ সালের ১৭ মে তহসেন আলীর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন মেহেরুন। তাঁর স্বামী স্কুল শিক্ষক। একাত্তরে নার্সিং কাজের সুবাদে মেহেরুন চাকুরি নেন ভোলাহাট স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে। বর্তমানে মেহেরুনের দুই ছেলে এক মেয়ে। তারা লেখাপড়া করছে। এদেশ থেকে সন্ত্রাস, দারিদ্র্য ও রাজাকার সমূলে ধ্বংস হবে, আজও এ প্রত্যাশায় বেঁচে আছেন মেহেরুন।

শাহানারা পারভীন শোভা
(বানারিপাড়া)

যুদ্ধের সময় তাঁর নাম ছিল শোভারাণী মণ্ডল। তিনি ছিলেন সাহসী মুক্তিযোদ্ধা। তাঁর ওপরে লেখা ফিচার পড়ি সাপ্তাহিক 'মুক্তিবার্তা' পত্রিকায়। শোভারাণী মণ্ডলের বর্তমান নাম শাহানারা পারভীন শোভা। পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে শোভার খোঁজে রওনা হই বানারিপাড়ার পথে। সেদিন ছিল ১৭ অক্টোবর বৃহস্পতিবার, ২০০২। বরিশাল থেকে বানারিপাড়া পৌঁছাই বেলা বারোটার দিকে। বানারিপাড়া পৌঁছানো মাত্র মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়। টানা আড়াই ঘণ্টার বৃষ্টিতে স্নাত বানারিপাড়া আমার কাছে সবুজ স্নিগ্ধ মনে হয়। শোভার গ্রামের নাম কুন্দিহার। একজন কিশোরীর সহযোগিতায় আমি শোভার বাড়ি খুঁজে বের করি।

শোভা ১৯৫৩ সালে পিরোজপুর জেলার স্বরূপকাঠি থানার জলাবাড়ি ইউনিয়নের গণপতিকাঠি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা পাঁচ ভাই এক বোন। মুক্তিযুদ্ধের আগেই মারা যান তাঁর বাবা সুরেশচন্দ্র মণ্ডল। পিতার মৃত্যুর পরে তাঁর মা মধুমালা মণ্ডল সংসারের হাল ধরেন। কিশোরী শোভা পড়াশোনার ফাঁকে সংসারের বিভিন্ন আয়মুখী কাজে সহযোগিতা করতেন। তাঁর লাগানো সবজি ও কাঁচা তরকারি বিক্রি থেকে সংসারের জন্য বেশ উপার্জন করতেন। শোভা তাঁর পরিবারকে যতটুকু সহযোগিতা করেছেন তাঁর চেয়ে বেশি নিজেকে উজাড় করে দিয়ে এক অনন্য ইতিহাসের সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছেন দেশের স্বাধীনতার জন্য ১৯৭১ সালে।

একাত্তরে শোভা ছিলেন নবম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত। গণপতিকাঠি গ্রামের সংবেদনশীল ও সাহসী এই কিশোরীকে জোর করে বিয়ে দেয় তাঁর কাকারা। বিয়ের পর শোভা আর স্কুলে যান নি। বাঙালি আর পাঁচটি নারীর মতো তাঁরও জীবনে ছিল স্বামীর ভালোবাসার সংসার। একদিন পাকসেনারা তাঁর সেই সুখের সংসার ভেঙে তছনছ করে দেয়। গাভা, নরেরকাঠি, কাচাবালিয়া, ব্রেমহল প্রভৃতি এলাকা ছিল হিন্দু অধ্যুষিত। মে মাসের ৪ তারিখে শর্ষিনা পীরের সহযোগিতায় রাজাকার ও পাকিস্তান বাহিনী ঐসব গ্রামে ঢুকে পড়ে। প্রথমে ব্রেমহল গ্রামে ঢুকে বাড়িঘর পুড়িয়ে গুলি

করতে করতে পাকসেনারা গাভা বাজারে আসে। গুলির শব্দে লোকজন এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতে থাকে। দূরে যেতে না পেরে তাঁরা অক্ষয় কুমারের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। অক্ষয় কুমার বাজারে ঘড়ি মেরামতের কাজ করতেন। শোভারানীর স্বামী রাজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস অক্ষয়ের দোকানে আসেন তাঁর হাতের ঘড়িটা নেয়ার জন্য। তিনি ঘড়িটি অক্ষয়কে সারাতে দিয়েছিলেন। ঐসময় রাজেন্দ্রনাথ বিশ্বাসসহ ২৭জনকে পাকসেনারা ধরে নিয়ে নরেরকাঠি চারের (সাঁকো) গোঁড়ায় গুলি করে হত্যা করে। ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী স্বামীর মৃত্যুর পরে স্ত্রীর শাঁখা খোলা হয় এবং সিঁদুর মুছে ফেলা হয়। কিন্তু শোভা স্বামীর এই অকাল মৃত্যু সইতে পারবে না ভেবে তাঁকে বলা হয়, 'রাজাকার ও পাকিস্তানিরা শাঁখা সিঁদুর দেখলেই ধরে নিয়ে যায়'— এ-বলে শোভার হাতের শাঁখা খুলে ফেলা হয় ও সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেলা হয়। পাকিস্তান বাহিনী চলে গেলে রাজেন্দ্রনাথের মরদেহ শোভাদের বাড়িতে আনা হয়। শেষবারের মতো প্রিয়তমের মরদেহ দেখে একেবারে বোবা হয়ে যান শোভা। মাত্র পাঁচ মাসের ব্যবধানে তাঁর দাম্পত্য-জীবনের অবসান ঘটে।

এ সময় স্বরূপকাঠি অঞ্চল ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের শক্ত ঘাঁটি। স্বামীর মৃত্যুর পরে শোভা পাথর প্রায়। তাঁর সেই পাথর-জমানো শোককে বারুদে পরিণত করেন রাজনীতিবিদ সিরাজ শিকদার। তখন সিরাজ শিকদারের ছদ্মনাম আঃ ছালাম। শোভার এই মর্মান্তিক ঘটনা জানার পর সিরাজ শিকদার শোভার কাছে যান এবং তাঁকে স্বামীর হত্যার প্রতিশোধ নিতে উদ্বুদ্ধ করেন। শোভার হাতে তিনি তুলে দেন অস্ত্র। শোভার হাতে অস্ত্র দিয়ে শোভাকে বলেন, 'যা তুই তোর স্বামীর হত্যার প্রতিশোধ নে।' সিরাজ শিকদারের ওই অগ্নিমন্ত্রে শোভার বুকে প্রতিশোধের স্পৃহা দাবানলের মতো জ্বলে ওঠে।

শোভার জীবনে শুরু হয় আর এক অধ্যায়। তিনি স্বরূপকাঠিতে কমান্ডার আতাউর রহমান, কমান্ডার সেলিম, কমান্ডার শাহনেওয়াজ, কমান্ডার বেনীলাল দাসগুপ্ত, ক্যাপ্টেন বেগ ও কালামের নিকট সরাসরি অস্ত্রের প্রশিক্ষণ নেন। অস্ত্র ব্যবহারে তিনি এতই পারদর্শী হন যে, দুই হাতে দুইটি অস্ত্র নিয়ে একই সাথে নিপুণভাবে নির্দিষ্ট নিশানায় গুলি ছুড়তে পারতেন। এছাড়া দিনে দিনে তিনি ছদ্মবেশ ধারণে হয়ে ওঠেন অত্যন্ত পারদর্শী। পুরুষের মতো চুল ছেঁটে, প্যান্ট পরে, আবার কখনো ভিখারি, পাগলি বেশ ধারণ করে শত্রুপক্ষের ঘাঁটি নির্ধারণ করেছেন। আঘাত হেনেছেন শত্রুঘাঁটিতে।

একদিন পাকবাহিনীর একটি দল কড়িয়ানা গ্রামে তাণ্ডব চালায়। শোভা ৯জন গেরিলাযোদ্ধা নিয়ে খালের পাড়ে ওঁৎ পেতে থাকে। পাকবাহিনী তাদের দোসরদের সহযোগিতায় এক বাড়ি থেকে একজন তরুণীকে ধরে নিয়ে অপেক্ষমাণ বোটে ওঠে। শোভা সুযোগ বুঝে পাকিস্তানি বোটে গ্রেনেড নিক্ষেপ করে। গ্রেনেড হামলায় বোটটি ডুবে যায়। মেয়েটি সাঁতার কেটে নিরাপদ জায়গায় চলে যেতে সক্ষম হয়। কিন্তু

পাকসেনারা জলে ডুবে হাবুডুবু খেতে থাকলে শোভা ও তাঁর সহযোগীরা তাদের জল থেকে তুলে পেয়ারা বাগানে নিয়ে যায়। সেখানে তাদেরকে হত্যা করা হয়।

পাকসেনা হত্যার খবর দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। প্রতিশোধ নেয়ার জন্য পাকিস্তানিরা বেপরোয়া হয়ে ওঠে এবং পেয়ারা বাগান আক্রমণ করে নির্বিচারে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। ধর্ষণ ও হত্যার হোলি খেলায় মেতে ওঠে পাকবাহিনী ও তাদের দোসররা। এসময় তিনজন মুক্তিযোদ্ধা পাকবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে এবং পাকবাহিনীর হাতে নির্মমভাবে নিহত হন। এরপর শোভা ও তাঁর সহযোগীরা কিছুটা সরে এসে ছাচিয়া গ্রামে এক মেম্বারের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। সেখানে তাদের দেখা হয় কমান্ডার ফিরোজ কবিরের সাথে। ফিরোজ কবিরের সহায়তায় সেখানে তাঁরা বেশ কয়েকটি অপারেশন চালায়। একদিন পাকিস্তানি দালালরা শোভাকে ধরিয়ে দেয় পাকসেনাদের হাতে। শোভাকে পাঠিয়ে দেয়া হয় বরিশাল জেলখানায়। ১৭দিন বরিশাল জেলে বন্দি থাকার পর চাখার কলেজের অধ্যক্ষ এনায়েত করিমের সহযোগিতায় তিনি মুক্ত হন। এরমধ্যে ৯ নং সেক্টরের সাব সেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন শাহজাহান ওমর শোভার কথা জানতে পারেন এবং তিনি শোভাকে নিজের দলে অন্তর্ভুক্ত করেন। অবশ্য জেল থেকে বের হয়ে শোভা বসে থাকেন নি। নিজ এলাকায় নিজের দল পুনর্গঠন করার কাজ করছিলেন। ক্যাপটেন শাহজাহান ওমরের নেতৃত্বে শর্ষিনা পীরের বাড়ি ও নেছারাবাদসহ ৬টা অপারেশনে অংশ নেন শোভা। এসব অপারেশনে তিনি দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, সেসময় ৩৬ হ্যান্ড গ্রেনেড দিয়ে যে সুইসাইড স্কোয়াড গড়ে উঠেছিল তাতে তিনজন নারী অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তার একজন শোভা অপর দুজন বিথিকা এবং মনিকা।

যুদ্ধ শেষ হলো। দেশ শত্রুমুক্ত হলো। স্বাধীন দেশ, জাতীয় পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত সবই পাওয়া গেল। বীরদর্পে পুরুষযোদ্ধারা ঘরে ফিরল। তাঁরা সোনার ছেলে সাহসী ও দেশপ্রেমিক। আর শোভার ভাগ্যে স্বীকৃতির পরিবর্তে জুটল তিরস্কার। সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধার পরিবর্তে উপাধি পেলেন নির্যাতিতা বা বীরাঙ্গনা হিসেবে। দেশের জন্য সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ করেছেন, পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যখন যুদ্ধ করেছেন তখন শোভা ছিল সহযোদ্ধা। দেশ স্বাধীনের পরে যখন প্রয়োজন শেষ, তখন শোভা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সম্মানের পরিবর্তে পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার শিকার হলেন। নারীর প্রতি সমাজের অবমাননাকর ধারণা যুদ্ধের মাধ্যমেও বদলাল না।

শরীর নিয়ে শোভার ভেতরে নানা প্রশ্ন জাগে। নারী হওয়ার কারণে সামান্য আশ্রয়টুকু না পেয়ে ঝালকাঠি নারী পুনর্বাসন কেন্দ্রে আশ্রয় নেন তিনি। আশ্রয়কেন্দ্রে থাকাকালীন তিনি একবছর মাতৃমঙ্গল বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেন। এখানেও তিনি নানা প্রশ্নে জর্জরিত হন। সম্মুখীন হন সামাজিক নানা প্রশ্নের। পরে বাধ্য হয়ে চলে যান ভারতে। কিন্তু ভারতের মাটি বেশিদিন তাঁকে আটকে রাখতে পারে নি। স্বদেশের মাটির টানে দু'বছর পরে আবার তিনি দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে এলে বিভিন্ন

জন বিভিন্নভাবে উত্যক্ত করত তাঁকে। কেউ কেউ তাঁর নিকট বিভিন্ন প্রকার প্রস্তাব নিয়ে আসত। তিনি বাধ্য হয়ে সহ্য করতেন। তাঁর মনে হয়েছে স্বাধীনতা যুদ্ধে যাওয়া তাঁর জন্য ছিল পাপ। দেশে ফিরে এসে তিনি রেডক্রসে ম্যাটারনিটিতে ট্রেনিং নেন। প্রাক্তন মন্ত্রী সুনীল গুপ্তের চেষ্টায় ১৯৮২ সালে থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মাস্টার রোলে স্লিপ দেয়ার চাকুরি নেন। তখন তিনি বেতন পেতেন ৪৫০ টাকা। ১৯৮৮ সালে পরিবার পরিকল্পনা সহকারী হিসেবে যোগদান করে এ পর্যন্ত কর্মরত আছেন।

১৯৮২ সালের অক্টোবর মাসের ১০ তারিখ তিনি বানারিপাড়ার দলিল লেখক শাহজাহান মিঞার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর একটি ছেলে ও একটি মেয়ে জন্মগ্রহণ করে। মেয়ের নাম তানজিলা আক্তার তনু ও ছেলের নাম তবিবুর রহমান সুজন।

স্বামী হত্যার প্রতিশোধের আগুন আজও প্রজ্জ্বলিত শোভার মনের গভীরে। বয়সের ভারে শোভার মাথার সামনের চুল সাদা হয়েছে, স্বাস্থ্য ভেঙেছে কিন্তু ভাঙে নি তাঁর মনের অভাবনীয় শক্তি। আজও শোভা স্বপ্ন দেখে তাঁর স্বামীর হত্যাকারীর বিচার হবে। বিচার হবে এ মাটিতে-ই ...!

উর্মিলা রায়
(কাউখালি)

ছায়াঘন নয়নাভিরাম শান্তির গ্রামে শান্তি নাই। পাকবাহিনীর আক্রমণ শুরু হয়েছে। উর্মিলার থাকার ঘর, রান্নাঘর, গরুর ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। লুটে নিয়েছে তার সর্বস্ব, গ্লাসটি পর্যন্ত নেই। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে পাকসেনারা। জনমানব শূন্য পুরিতে পরিণত হয়েছে সমস্ত এলাকাটা। পাকবাহিনীর নির্মম নির্যাতনে লাখো বাঙালি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। সদ্য বিবাহিতা তের বছরের একমাত্র আদরের মেয়েকে নির্মমভাবে নির্যাতন ও হত্যা করে পাকসেনারা। প্রতিশোধের আগুন এবং দেশের মুক্তির সংগ্রাম রিক্ত উর্মিলাকে ক্ষিপ্ত বাঘিনীতে পরিণত করে। চেষ্টা করেন তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য।

জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে উর্মিলার পাশের বাড়িতে মুক্তিযুদ্ধের ক্যাম্প স্থাপন করে মুক্তিযোদ্ধারা। সুগম হয় উর্মিলার মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের পথ। মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হাই— ওনার মাধ্যমে তিনি ক্যাম্পে যান এবং মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন।

ক্যাম্পে থাকতে থাকতে অস্ত্র ব্যবহারে প্রশিক্ষণ নেন তিনি। উর্মিলা রাইফেল ও গ্রেনেড চালানো প্রশিক্ষণে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। একই সাথে পারদর্শী হন ছদ্মবেশ ধারণ কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণে। তাঁকে প্রশিক্ষণ দেন কমান্ডার আঃ হাই।

উর্মিলা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করেছেন এবং রান্না করে খাইয়েছেন। কাছাকাছি ক্যাম্পে খবর ও তথ্য আদান-প্রদানের দায়িত্ব পালন করেছেন অত্যন্ত সুচারুভাবে। শত্রুঘাঁটি রেকি করার কাজে তিনি ছিলেন পারদর্শী। অস্ত্রশস্ত্র রক্ষণাবেক্ষণের কাজে তিনি ছিলেন অত্যন্ত পটু। পুরুষ যোদ্ধাদের পাশাপাশি দিবা-রাত্রি ক্যাম্পে থেকে, ক্যাম্পের খুঁটিনাটি সকল কাজে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করতেন অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে।

আহত যোদ্ধাদের মাতৃস্নেহে সেবা করেছেন। তাঁর অদম্য দেশপ্রেম দেখে সন্তুষ্ট হন ক্যাম্পের সকল মুক্তিযোদ্ধাসহ কমান্ডার আঃ হাই। বিভিন্ন দায়িত্ব পালনে প্রশংসিত হন তিনি।

দেশ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু অর্থনৈতিক মুক্তি আসে নি। উর্মিলার বাড়ির ভিটায় আর নতুন ঘর তুলতে পারেন নি তিনি। থাকেন ভাতিজার বাড়িতে। ঝিয়ের কাজ করেন তিনি। ঝিয়ের কাজ করে যা কিছু পান তাই দিয়ে দিন কেটে যায় তাঁর। সবাই তাঁকে ভালবাসে। মেয়ের শোকে বুক ভাসে সন্তানহারা উর্মিলার। গভীর রাতে করুণ সুরে কাঁদেন সর্বহারা উর্মিলা। তাঁর কান্নায় এখনো বাতাস ভারি হয়ে ওঠে। প্রতিবেশীরা সান্ত্বনা দেয়, কিন্তু কোনো সান্ত্বনায়ই তৃপ্ত হয় না সন্তানহারা মায়ের মন। সকল দুঃখের মাঝেও তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং দেশ স্বাধীন হয়েছে— এটাই তাঁর জীবনের সকল শোক ও ক্ষতির সান্ত্বনা এবং শ্রেষ্ঠ গৌরব।

মুক্তিযোদ্ধা উর্মিলা রায়ের জন্ম ১৯৪৩ সালের ১ এপ্রিল, পিরোজপুর জেলার কাউখালি থানার আমড়াঝুড়ি ইউনিয়নের গন্ধব গ্রামে। তাঁর বাবা রাজেন্দ্রনাথ বাড়ৈ ছিলেন কৃষক এবং মা মনোরমা রায় গৃহিণী। দুই ভাই ও দুই বোনের মধ্যে উর্মিলা বড়।

১৯৫৪ সালের ৮ নভেম্বর ঝালকাঠি জেলার শেখের হাট ইউনিয়নের গরঙ্গল গ্রামের শরৎচন্দ্র রায়ের সাথে বিয়ে হয় উর্মিলার। একাত্তরের পূর্বে তাঁর স্বামী শরৎচন্দ্র রায় একটি কন্যা সন্তান রেখে ইহলোক ত্যাগ করেন। স্বামীর মৃত্যুর পরে অর্থাভাবে মাঝেমধ্যে বাবার বাড়িতে থাকতেন বিধবা উর্মিলা। একাত্তরের মার্চ মাসে তিনি ছিলেন তাঁর স্বামীর বাড়ি গরঙ্গলে। গরঙ্গল গ্রামে পাকসেনাদের আক্রমণের পরে বাপের বাড়িতে চলে আসেন উর্মিলা।

মধুমিতা বৈদ্য
(মীরসরাই, চট্টগ্রাম)

১৯৫৭ সালের ১৯ জানুয়ারি মধুমিতা মীরসরাইয়ের গোপীনাথপুরে জন্মগ্রহণ করেন। '৭১-এ চৌদ্দ বছরের মধুমিতা নবম শ্রেণীর ছাত্রী। ঐ সময়েই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন তিনি। পিতা ক্ষিতিশচন্দ্র বৈদ্য সেনাবাহিনীতে চাকরি করতেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১নং সেক্টর হরিয়ানায় যুদ্ধ করেছেন তিনি। মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় বসতি হওয়ায় প্রতিনিয়তই জীবন আর ইজ্জতের ওপর হুমকি আসতে থাকে মধুমিতাদের পরিবারের ওপর। ইতোমধ্যে বাবা ক্ষিতিশচন্দ্র বৈদ্য মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করলে আরো অনিশ্চিত হয়ে পড়ে তাদের জীবন। এরকম পরিস্থিতিতে বাবা তাঁদেরকে নিয়ে ২নং সেক্টর বিশ্রামগঞ্জে নিয়ে যান।

ভারতের বিশ্রামগঞ্জের হাসপাতালে মধুমিতা নার্সিংয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ক্যাম্পে অবস্থানরত আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বক্ষণিক সেবা প্রদান করে তিনি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে করেছেন মহিমান্বিত। মধুমিতার ক্যাম্পে ছিলেন কর্নেল রব, সেতারা বেগম, শেখ আলম, জ্ঞান বিকাশ বড়ুয়া, সুফিয়া কামালের মেয়ে সুলতানা এবং সাইদা কামাল। স্বাধীনতার পরেও মাসতাননগর হাসপাতালে নরওয়ের চিকিৎসা দলের সাথে সেবিকা হিসেবে কাজ করেন তিনি। নার্সিংয়ের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেছেন বিচক্ষণতার সাথে। মাইলের পর মাইল বিপদসঙ্কুল পথ পাড়ি দিয়ে প্রয়োজনীয় সংবাদ পৌছে দিয়েছেন ক্যাম্প থেকে ক্যাম্পে। কতবার চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে নিপুণ দক্ষতায় উৎরে গেছেন তাঁর লক্ষ্যের দিকে। নানান ছদ্মবেশের অন্তরালে অবলীলায় সহযোগিতা করেছেন মুক্তি সংগ্রামের বীর সেনানীদের। সেবা দিয়েছেন; মমতা দিয়েছেন; সাহস যুগিয়েছেন; অবিশ্বাস্য শ্রম দিয়ে সারিয়ে তুলেছেন বীর সেনাদের। হাতে তুলে দিয়েছেন অস্ত্র।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে গুলিবিদ্ধ শেখ আসলাম এবং জ্ঞানবিকাশ বড়ুয়াসহ অসংখ্য যোদ্ধার সেবা করে তাঁদের সুস্থ করেছিলেন যে মধুমিতা, চারদিকের মুক্তিহীন মানুষ, সাম্প্রদায়িকতা, দখলদারিত্ব, সন্ত্রাস আর রাহাজানির বীভৎস চিত্র দেখে তার হৃদয় বিক্ষত হয়।

প্রশিকা মীরসরাই উন্নয়ন এলাকার সংগঠিত নারী কল্যাণ সমিতির সদস্য মধুমিতা চার সন্তান নিয়ে মোটামুটি বেঁচে আছেন তিনি। দেশ স্বাধীন হবে; বাঙালি জাতি মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে; আমরা আমাদের অধিকার নিয়ে বাঁচব— এরকম প্রত্যয়, আশা নিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন তিনি। পিতা, মাতা এবং অগ্নিকন্যা মতিয়া চৌধুরীর প্রেরণায় সেবিকা হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন তিনি। তার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে কি ? —প্রশ্ন করা হলে দীর্ঘশ্বাস ছাড়া কোনো উত্তর মেলে না।

নতুন প্রজন্মের প্রতি তাঁর পরামর্শ জানতে চাইলে তিনি স্বাধীনতার ইতিহাস বিকৃতির হাত থেকে জাতিকে রক্ষা করবার জন্য নতুন প্রজন্মের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

মাত্র বত্রিশ বছরের মধ্যে একটি জাতির অর্জন চুরি হয়ে যাবে কতিপয় জঘন্য তস্করের হাতে একথা বিশ্বাস করতে পারেন না মধুমিতা। '৭১-এ স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ বিরোধিতাকারী যারা আমাদের বোনদের ইজ্জত লুট করেছে, যারা আমাদের অগ্নি সেনাদের নির্মমভাবে হত্যা করেছে— তাদের বিচার দাবি করেন মধুমিতা। রাজাকার আলবদরদের যারা পুনর্বাসিত করেছে তাদেরও বিচার করতে হবে— এ প্রত্যয়ই ঘোষিত হলো দুরন্ত বীর মধুমিতার কণ্ঠে। মধুমিতা চান একটি অসাম্প্রদায়িক, শোষণহীন বাংলাদেশ।

শিরিন শাহনেওয়াজ
(পিরোজপুর)

'বঙ্গবন্ধুর দেয়া ৭ মার্চ ভাষণের পর থেকেই পিরোজপুরের সকল স্তরের জনগণের মধ্যে অভূতপূর্ব জাগরণ শুরু হয়। ১০ মার্চ ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীরা বাঁশের লাঠি ও লোহার বল্লম হাতে নিয়ে, মাথায় লালটুপি পরে মুক্তি আন্দোলনের প্রস্তুতি হিসেবে প্রথম মিছিল বের করে। মিছিলে অন্যান্য মেয়েদের সাথে আমিও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলাম।'— কথাগুলো দীপ্তকণ্ঠে বললেন মুক্তিযোদ্ধা শিরিন শাহনেওয়াজ।

শিরিন শাহনেওয়াজ ১৯৫৭ সালে ১ চৈত্র তৎকালীন পিরোজপুর মহকুমার রাজারহাট মহল্লায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা হাবিবুর রহমান এবং মা আমেনা বেগম। চার ভাই ও পাঁচ বোনের মধ্যে শিরিন তৃতীয়। বাবা হাবিবুর রহমান একজন ধর্মভীরু মানুষ হলেও পারিবারিকভাবে ছিলেন সংস্কৃতিমনা এবং অত্যন্ত প্রগতিশীল চিন্তার মানুষ। একাত্তরে শিরিনের বয়স তের বছর। বয়সে কিশোর হলেও একাত্তরে ছাত্র ইউনিয়নের রাজনীতির সাথে সরাসরি জড়িত ছিলেন তিনি। তাঁর অগ্রজা রোকেয়াও ছাত্র ইউনিয়নের সাথে সরাসরি জড়িত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, পারিবারিক সূত্রে অগ্নিকন্যা বেগম মতিয়া চৌধুরী ছিলেন শিরিনের আত্মীয়। সেই সুবাদে তিনি ছাত্র রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন।

৯ নং সেক্টরের সাব-সেক্টর কমান্ডার মেজর জিয়াউদ্দিন এবং মুক্তিযোদ্ধা এমএ মান্নানের নিকট থেকে জানতে পাই মুক্তিযোদ্ধা শিরিন শাহনেওয়াজের কথা। ঢাকা থেকে বাসযোগে পিরোজপুরে পৌঁছাই ২০০২ সালের ১১ অক্টোবর শুক্রবার বেলা তিনটার দিকে। হাজার বছরের পুরনো জনপদ পিরোজপুর। এত পুরনো জনপদ হলেও যোগাযোগ ব্যবস্থার তেমন অগ্রগতি হয় নি। মুক্তি সংগ্রামের সময় একমাত্র নৌপথই ছিল এখানকার যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম। দক্ষিণাঞ্চলের প্রকৃতির চিরন্তন বৈশিষ্ট্য এখানে বিদ্যমান। নারিকেল, সুপারিসহ নানান জাতের বৃক্ষরাজিতে আচ্ছাদিত এই জনপদ।

মুক্তিযোদ্ধা এমএ মান্নানের সহযোগিতায় একটা রিকশা নিয়ে পৌছালাম শিরিন শাহনেওয়াজের বাসায়। এটা শিরিনের বাবার বাসা। একাত্তরের অনেক স্মৃতি জড়িত রয়েছে এই বাসাটিতে। এই বাসায় বসে স্বাধীন দেশের পতাকা বানানো, তাঁদের বাসায় পাকবাহিনীর হানা দেয়া, তাঁর বড়ভাইকে ধরে নিয়ে যাওয়া— এসব ঘটনা এখনো তাঁর কাছে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। বাড়ির পশ্চিমপাশে বলেশ্বর নদী। নদী তীরেই একাত্তরের সাক্ষী হয়ে আছে বধ্যভূমিটি, এখানে আরেকটা বধ্যভূমি। এখনো বলেশ্বর নদীর পাড়ের কথা মনে হলে আঁতকে ওঠেন শিরিন। বাতাস থেকে এখনো যেন তাঁর নাকে লাশের গন্ধ ভেসে আসে।

মার্চের উত্তাল দিনগুলোর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি আবেগে আপ্লুত হয়ে বলেন, 'মার্চের প্রতিটি দিনে আমাদের কোনো না কোনো কর্মসূচি ছিল। ২২ মার্চ বিভিন্ন সংগঠনের কর্মীরা ঘরে বসে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা তৈরি করেন এবং প্রত্যেক ঘরে ঘরে পৌছে দেয়া হয় পতাকা। ২৩ মার্চ প্রথম পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। প্রথম পতাকা উত্তোলন করেন তৎকালিন ছাত্রলীগের সভাপতি ওমর ফারুক। একই দিনে সারা পিরোজপুর সদরে সকল দোকান-বাড়ি-ঘরে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়।'

পাকসেনাদের 'প্রতিরোধ প্রস্তুতি' হিসেবে পিরোজপুরে সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় ২৫ মার্চের পরে। কার্যত এই প্রতিরোধ প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে পিরোজপুরে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হয়। পাকবাহিনীর অত্যাচার থেকে পিরোজপুর এলাকাকে রক্ষা করার জন্য ২৮ মার্চ ছেলেদের জন্য সশস্ত্র প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ছেলেদের পাশাপাশি একই সময় পিরোজপুর শহর ও পাশের গ্রামগুলো থেকে মেয়েদেরকে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য বাছাই করা হচ্ছিল। প্রথম ব্যাচে বাছাই করা হয় ২০জন মেয়ে, বাছাইকৃত ২০জনের মধ্যে শিরিন শাহনেওয়াজ অন্তর্ভুক্ত হন। তখন মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য এই বাছাই প্রক্রিয়া এবং প্রশিক্ষণের সার্বিক নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মেজর জিয়াউদ্দিন, মুক্তিযোদ্ধা এম এ মান্নান, আলী হায়দার খানসহ অনেকে। একাত্তরে ২৯ মার্চ শিরিনের প্রশিক্ষণ শুরু হয়।

পিটি, প্যারেড, গ্রেনেড নিক্ষেপ, রাইফেল চালানো এবং বিভিন্ন বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহারের প্রশিক্ষণ নেন শিরিন। মুক্তিযোদ্ধা ফজলুল হক ও মুক্তিযোদ্ধা সফিউদ্দিন তাঁদের প্রশিক্ষণ দেন। পিরোজপুর ওয়াপদা স্কুলের মাঠে (বর্তমান পানি উন্নয়ন বোর্ড) তাঁদের প্রশিক্ষণ হয়। আগ্নেয়াস্ত্রের পাশাপাশি তিনি নার্সিং প্রশিক্ষণও গ্রহণ করেন। নার্সিং প্রশিক্ষণ দেন ডা. শ্যামাচরণ সাহা এবং ডা. মমতাজ উদ্দিন। একমাস তাঁদের প্রশিক্ষণ ও মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি চলে। প্রশিক্ষণ শেষে সংগঠিত হতে থাকে মুক্তিযোদ্ধারা।

৪ মে ১৯৭১ পাকসেনারা পিরোজপুরে আসে। পাকবাহিনী হুলারহাট লঞ্চঘাটে নেমেই নির্বিচারে গুলি চালায় এবং বাড়িঘর ও দোকানে আগুন দেয়। ঐদিন

পিরোজপুরের এসডিও ও এসপিওসহ বেশ কয়েকজন বাঙালি কর্মকর্তাকে পাকসেনারা বলেশ্বর নদীর তীরে হত্যা করে। মানুষ হতবাক হয়ে পড়ে এই বীভৎস দৃশ্য দেখে।

এদিকে মুক্তিযোদ্ধারা মাসব্যাপী পাকসেনাদের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ গড়ে তুলছিল, পাকসেনাদের ভারি অস্ত্রের কাছে তা কর্পুরের মতো হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে মুক্তিযোদ্ধারা। পিরোজপুরে থাকা নিরাপদ নয় ভেবে জুন মাসে শিরিন শাহনেওয়াজ তাঁর পরিবারের সাথে স্বরূপকাঠি চলে যান। স্বরূপকাঠি থেকেও তিনি নানাভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষার চেষ্টা করেন। ওই সময় ছালাম ভাই নামে এলাকায় পরিচিত এক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের সন্ধান পান তিনি। পরিবারের সকল বাধা উপেক্ষা করে শিরিন ও তাঁর বোন হেনা কমান্ডার ছালামের নিকট যান এবং ইতিপূর্বে তাঁদের মুক্তিযুদ্ধে যোগদান ও প্রশিক্ষণের বর্ণনা দেন। কমান্ডার ছালাম শিরিন শাহনেওয়াজের আগ্রহে খুশি হন এবং তাঁদের মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের অনুমতি দেন। ছালামের অনুমতি পেয়ে শিরিন শাহনেওয়াজ নিয়মিত মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেন। মূলত ইনফরমার হিসেবে কাজ শুরু করেন শিরিন। তিনি বিভিন্ন ছদ্মবেশ ধারণ করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, অস্ত্র গোলাবারুদ এক ক্যাম্প থেকে অন্য ক্যাম্পে আনা-নেয়ার কাজ করতেন। মাঝে মাঝে তিনি আহতদের সেবা-শুশ্রূষাও করেছেন। তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব অতিশয় গুরুত্বের সাথে পালন করতেন তিনি। দায়িত্ব পালনের জন্য কমান্ডার আঃ ছালাম বহুবার তাঁকে প্রশংসা করেছেন। শিরিন পরে জানতে পারেন এই আঃ ছালাম ওরফে ছালাম ভাই-ই ছিলেন সিরাজ শিকদার।

দেশ স্বাধীনের পর পিরোজপুরে চলে আসেন শিরিন শাহনেওয়াজ। একদিকে লাশের গন্ধ, মৃত্যু, কান্না অন্যদিকে বিজয়ের আনন্দ! একাত্তরের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি আবেগে আপ্লুত হন। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন, 'আমরা মুক্তির জন্য যুদ্ধ করে স্বাধীনতা পেয়েছি। আমার চাওয়া পাওয়ার কিছু নেই। তবে এটুকুই চাই যেন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শে বেড়ে ওঠে।'

১৯৭৮ সালে এসএসসি এবং ১৯৮৩ সালে এইচ এস সি পাশ করেন শিরিন শাহনেওয়াজ। সাতক্ষিরা নিবাসী বদরুদ্দজা মিঠুকে বিয়ে করেন তিনি। গৃহিণী শিরিন এক ছেলে ও এক মেয়ের জননী।

রেজাফুননেছা
(ভোলাহাট)

রেজাফুননেছার সংবাদ পাই মুক্তিযোদ্ধা সামছুন্নাহার ও মুক্তিযোদ্ধা মেহেরুন্নাহারের নিকট থেকে। ৪ নভেম্বর, ২০০২ তারিখ বিকাল চারটার দিকে তাঁর বাড়িতে যাই। অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সাজানো-গোছানো তাঁর বাড়িটি। উঠানের কোণে একটা সজনে গাছের তলায় বসলাম আমরা। মুক্তিযোদ্ধা রেজাফুন সহজ-সরল একজন মানুষ। স্বাভাবিকভাবে দেখলে মনেই হবে না একাত্তরে এত প্রতিকূলতার ভেতরেও এমন বীরত্বপূর্ণ কাজ করতে পেরেছেন তিনি।

রেজাফুননেছার জন্ম ১৯৫৩ সালে ভোলাহাট থানার গোহালবাড়ি ইউনিয়নের বজরাটেক গ্রামে। তাঁর বাবা লাল মোহাম্মদ শেখ ছিলেন কৃষক এবং মা মুক্তা বিবি গৃহিণী। তাঁরা এক ভাই ও তিন বোন।

একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে রেজাফুন নবম শ্রেণীর ছাত্রী ছিলেন। মে মাসের দিকে পাকবাহিনী স্থায়ীভাবে ঘাঁটি গাড়ে গোমস্তাপুর থানায়। গোমস্তাপুর থানাটি ভোলাহাট থানার পূর্বপাশে অবস্থিত। পাকবাহিনী ও রাজাকারেরা মাঝেমধ্যেই গোমস্তাপুর থেকে আক্রমণ চালাত ভোলাহাট থানার বিভিন্ন গ্রামে। দখলদার বাহিনীর এহেন কার্যকলাপে প্রচণ্ড ঘৃণা ও ক্ষোভ জন্ম নেয় রেজাফুনের মনে। প্রতিশোধের জন্য প্রতিবাদী রেজাফুন নানাভাবে সুযোগ খুঁজতে থাকেন মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য।

ভোলাহাট থানার গিলাবাড়িতে ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প এবং অস্থায়ী হাসপাতাল। আগস্ট মাসের দিকে এই হাসপাতালে আসতে থাকে অগণিত আহত মুক্তিযোদ্ধা কিন্তু হাসপাতালে ডাক্তার, নার্স ও চিকিৎসা-সামগ্রী ছিল চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। সীমিত সংখ্যক নার্স ও ডাক্তারদের পক্ষে এত আহতদের সামলানো প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। ওই সময় ডাক্তারদের চিকিৎসা কাজে সহযোগিতার জন্য এলাকা থেকে কিছু সংখ্যক শিক্ষিত মেয়েদের খোঁজ করা হচ্ছিল। রেজাফুননেছা তখন তাঁর বান্ধবী সামছুন্নাহারের সহযোগিতায় মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার হাফিজুদ্দিন হাসনুর নিকট যান এবং মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। কমান্ডার হাসনুর নির্দেশে নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময় রেজাফুননেছা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন।

রেজাফুননেছার প্রশিক্ষণ হয় ভোলাহাটের গিলাবাড়ি এবং ভারতের মালদহ জেলার আদমপুর ক্যাম্পে। তিন সপ্তাহের একটি নার্সিং প্রশিক্ষণ হয় তাঁদের। নার্সিং প্রশিক্ষণ মূলত হাতে-কলমে হয়। ডাক্তার জসি ও ডাক্তার বিপেন তাঁদের নার্সিং প্রশিক্ষণ দেন। নার্সিং প্রশিক্ষণের পাশাপাশি আগ্নেয়াস্ত্রের প্রশিক্ষণও গ্রহণ করেন তিনি। আগ্নেয়াস্ত্রের মধ্যে গ্রেনেড ছিল অন্যতম।

নার্স হিসেবে তিনি যে-সমস্ত ডাক্তারদের সাথে কাজ করেছেন তাদের মধ্যে ডাক্তার জসি, ডাক্তার বিপেন ও ডাক্তার ইয়াসিন অন্যতম। আহত মুক্তিযোদ্ধার ক্ষতস্থান পরিষ্কার করা, ব্যান্ডেজ করা, ইসজেকশন পুশ করা, ঔষধ খাওয়ানোর কাজ করতেন তিনি। দেশ স্বাধীনের পূর্ব পর্যন্ত তিনি নার্স হিসেবে কাজ করেছেন। তাঁর সাথে আরো যারা নার্স হিসেবে কাজ করেছেন তাঁদের মধ্যে মেহেরুন্নাহার, সামছুন্নাহার, আঞ্জুমান আরা, মর্জিনাসহ অনেকে। একাত্তরে পাকসেনাদের নিষ্ঠুর নির্যাতনের একটি দৃশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'গোমস্তাপুর থানা হানাদারমুক্ত হওয়ার পরের দিন আমরা কয়েকজন নার্স সশস্ত্রযোদ্ধাদের সাথে রণাঙ্গন দেখতে গেলাম গোমস্তাপুর থানার রহনপুর নামক স্থানে। রহনপুর রণাঙ্গনে পাকিস্তানিদের বাংকার দেখে স্তব্ধ হয়ে যাই। আমার বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে সেই লোমহর্ষক দৃশ্য দেখে। বাংকারের সেই দৃশ্য মনে পড়লে এখনো বুকের ভেতরটা মোচড় দেয় আমার। মেয়েদের চুলের গোছা, চুলের বেণি, মাথার ফিতা, পায়ের নূপুর, ছিন্নবিচ্ছিন্ন জামা কাপড় বাংকারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখেছি। যুদ্ধ চলাকালে নরপশুরা মেয়েদের ওই বাংকারে রেখেছে। বাংকারের ভেতরে বসেই তাঁদের নির্যাতন করেছে। জানি না, কত নারীকে ওই সমস্ত বাংকার এবং ক্যাম্পে নিজেদের বিসর্জন দিতে হয়েছে। ওই সমস্ত লোমহর্ষক ঘটনা মনে হলে এখনো আমার শরীর অবশ হয়ে যায়।'

দেশ স্বাধীন হয়েছে। পুরুষ যোদ্ধারা ঘরে ফিরেছে স্বস্বস্থানে আর নারী যোদ্ধাদের ভাগে জুটেছে তিরস্কার। তিনি দুঃখ করে বলেন, 'প্রথমত আমরা নারী তারপর গিয়েছি মুক্তিযুদ্ধে। পুরুষের শাসনের এই সমাজ মেয়েদের সাহসকে ভাল চোখে দেখে নি। পুরুষরা তো চায় মেয়েরা শুধুই ঘরে বসে গৃহস্থালির কাজ করবে। এ কারণে দেশের স্বাধীনতা অর্জন হলেও শাসকের মানসিকতার বদল হয় নি। আমরা মেয়েরা হয়েছি পুরুষদের সেই মানসিকতার শিকার।' তিনি দুঃখের সঙ্গে এইসব কথা বলেন। কার্যত মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করে অনেক তিরস্কার ও গঞ্জনা সইতে হয়েছে রেজাফুনকে।

১৯৭৮ সালে গোহালবাড়ি গ্রামের মোঃ দাসে আলীর সাথে তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। এক ছেলে এক মেয়ে তাঁর। বর্তমানে ভোলাহাট স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এম.এল.এস.এস পদে কাজ করছেন।

সন্ত্রাস, দারিদ্র্য ও রাজাকারমুক্ত একটি অসাম্প্রদায়িক দেশ প্রত্যাশা করেন রেজাফুননেছা।

মাহমুদা ইয়াসমিন
(রংপুর)

আকলিমা খন্দকারের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মুক্তিযোদ্ধা মাহমুদা ইয়াসমিনকে খুঁজে পাই রংপুর শহরে। রংপুর শহরের মুন্সিপাড়াতে থাকেন মাহমুদা ইয়াসমিন। তাঁর বাসায় আন্তরিক পরিবেশে ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০০৩ তারিখে কথা হয় তাঁর সাথে। মাহমুদা ইয়াসমিনের জন্ম ১৯৫৬ সালের ১৭ অক্টোবর কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গামারী থানার জয়মনিরহাট গ্রামে। বাবা মোঃ মোজাম্মেল হক এবং মা সালেহা খাতুন। দুই ভাই ও তিন বোনের মধ্যে মাহমুদা বড়।

মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অংশগ্রহণ সম্পর্কে তিনি বলেন— তাঁর বাবা মোঃ মোজাম্মেল হক ছিলেন রাজনৈতিকভাবে খুবই সচেতন এবং সক্রিয়। মার্চ মাসের পুরো সময়টা ছিল রাজনৈতিকভাবে অস্থিতিশীল। ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পর কার্যত প্রশাসনিক যন্ত্র বিকল হয়ে পড়ে। প্রতিদিন সভা-মিছিলে প্রকম্পিত জনপদ, একটা থমথমে ভাব। সবার মুখে একটাই রব কী হবে, কী হতে যাচ্ছে! তবে ভয়ঙ্কর কিছু একটা যে ঘটতে যাচ্ছে তাতে কোনো সন্দেহ নাই। ২৩ মার্চ রংপুরে বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করা হলে বিহারিরা ভেতরে ভেতরে ক্ষিপ্ত হতে থাকে। মাহমুদা তখন দশম শ্রেণীর ছাত্রী।

২৫ মার্চ রাতে ঢাকায় গণহত্যা শুরুর পরে এর প্রভাব রংপুরেও পড়ে। রংপুরে পাকবাহিনী ও বিহারিরা বেপরোয়া হয়ে ওঠে। তাদের নির্যাতন এবং অত্যাচার এত চরমে ওঠে যে, বাধ্য হয়ে তিনি তাঁর পরিবারের সাথে দাদাবাড়ি কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গামারী চলে যান। সেখানেও নিরাপত্তার অভাব ঘটায় এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে ভারতের কোচবিহার জেলার দিনহাটা শরণার্থী ক্যাম্পে চলে যান। পরে এপ্রিল মাসের শেষদিকে তিনি কোচবিহার জেলার চ্যাংড়াবান্দা শরণার্থী ক্যাম্পে যান পরিবারের সাথে।

বাংলাদেশের বুড়িমারি সীমান্তের ওপাশে ভারতের কোচবিহার জেলায় চ্যাংড়াবান্দা ক্যাম্প এবং অস্থায়ী হাসপাতাল। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা দিনে

দিনে এতই বাড়তে থাকে যে, আহতদের সামলানো সীমিত নার্স ও ডাক্তারদের জন্য কষ্টকর হয়ে পড়ে। এ সময় ৬ নং সেক্টরের সেক্টর কমান্ডারের নির্দেশে অস্থায়ী হাসপাতালে নার্স হিসেবে নিয়োগের জন্য শরণার্থী শিবিরগুলোতে শিক্ষিত মেয়েদের খোঁজ করা হচ্ছিল। মাহমুদা ইয়াসমিন তখন তাঁর বান্ধবী মমতাজের সাথে ওই হাসপাতালে নার্স হিসেবে যোগ দেন। মাহমুদার ইচ্ছা ছিল সশস্ত্র যোদ্ধা হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের। কিন্তু তখন নারীদের তারা সশস্ত্রযোদ্ধা হিসেবে নিয়োগ দিচ্ছিল না। তাই বাধ্য হয়ে নার্স হিসেবে কাজ করেন।

নার্স হিসেবে ডাক্তার মতিউর রহমানের নিকট থেকে তিনি প্রশিক্ষণ নেন। নার্সিং প্রশিক্ষণ হয় ১৫ দিনের। এই প্রশিক্ষণ হয় মূলত হাতেকলমে। নার্সিং প্রশিক্ষণ ছাড়াও আগ্নেয়াস্ত্র প্রশিক্ষণ নেন তিনি। আগ্নেয়াস্ত্রের মধ্যে ছিল গ্রেনেড ও বিভিন্ন বিস্ফোরক দ্রব্য। প্রশিক্ষণ দেন মেজর দেবা হোসেন এবং ক্যাপ্টেন মতিন। সিদ্ধান্ত ছিল, তাঁদের আরো ভারী অস্ত্রের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে কিন্তু দ্রুত দেশ স্বাধীন হয়ে যাওয়ার ফলে তাঁদের আর প্রশিক্ষণ দেয়া হয় নি। তিনি ভাবতে পারেন নি দেশ এত দ্রুত স্বাধীন হবে।

নার্স হিসেবে তিনি যে-সমস্ত কাজ করতেন তার মধ্যে ছিল আহতদের ক্ষতস্থান পরিষ্কার করা, ব্যান্ডেজ করা, ইনজেকশন পুশ করা, সময় মতো ঔষধ খাওয়ানো। এছাড়া ছোট ছোট অপারেশনের সময় তিনি ডাক্তারদের সাথে থেকেছেন এবং ডাক্তারদের সহযোগিতা করেছেন। আহত মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থা বেশি খারাপ হলে তারা জেলা সদরে পাঠিয়ে দিতেন। তিনি তাঁর দায়িত্ব অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে পালন করেছেন। তাঁর দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি ডাক্তারদের নিকট থেকে বহুবার প্রশংসিত হয়েছেন। নার্সিং কাজের সময় তাঁর সাথে আরো যারা ছিলেন তাঁদের মধ্যে মমতাজ, আকলিমা, রেনু, শামীমা, পেয়ারীর নাম তাঁর মনে আছে। রেনু, শামীমা, পেয়ারী এখন কোথায় আছেন তিনি তা জানেন না তবে আকলিমা, মমতাজ রংপুরে থাকেন।

স্বাধীনতার পরে মাহমুদা রংপুর সরকারি গার্লস স্কুল থেকে ১৯৭২ সালে এইচএসসি এবং ১৯৭৫ সালে রোকেয়া কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করেন। পরে ১৯৮৪ সালে তিনি কারমাইকেল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন। এরই মধ্যে ১৯৭৬ সালের ১৭ নভেম্বর জনাব ছিদ্দিকুর রহমানের সাথে তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। বর্তমানে তাঁর এক ছেলে ও এক মেয়ে।

মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর অনুভূতির কথা জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, 'আমরা স্বাধীন হয়েছি কিন্তু মুক্তি পাই নি। দেশ এখনো সন্ত্রাস, রাজাকার ও সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব মুক্ত হয় নি। তাই আমাদের আরো একটা যুদ্ধের প্রয়োজন আছে। যে যুদ্ধ হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের; হারিয়ে যাওয়া মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনার।'

ছালেহা বেগম
(মঠবাড়িয়া)

সাব-সেক্টর কমান্ডার মেজর জিয়াউদ্দিনের নিকট থেকে সংবাদ পেয়ে ছালেহা বেগমের সন্ধানে মঠবাড়িয়া যাই ৩ আগস্ট ২০০৩ সালে। বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী পিরোজপুর জেলার একটি থানা মঠবাড়িয়া। এই থানায় জন্ম নিয়েছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ছালেহা বেগম। ছালেহা বেগমের জন্ম ১৯৫৮ সালে মঠবাড়িয়া থানার বেতমোড় ইউনিয়নে। তাঁর পিতা আবুল হাসেম আকন্দ এবং মা মরিয়ম বেগম। পিতা ছিলেন পেশায় ডাক্তার এবং মা গৃহিণী। ছালেহা বেগম এগার ভাইবোনের মধ্যে পঞ্চম।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ছালেহা বেগমের বয়স ১৩ বৎসর। তাঁর বাবা এবং ভাইয়েরা রাজনীতি বিষয়ে ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। একাত্তরে তাঁর পরিবার আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিল। রাজনীতির বিভিন্ন জটিল সমীকরণ নিয়ে তারা বাসায় আলাপ-আলোচনা করতেন। এসব আলোচনা থেকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শোষণ দুঃশাসন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ছিল কিশোরী ছালেহার। এভাবে দিনে দিনে রাজনীতি সচেতন হয়ে ওঠেন তিনি। পাকিস্তানি মিলিটারি মঠবাড়িয়া অঞ্চলে প্রবেশ করে মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে। তাদের সহযোগিতা করে স্বাধীনতাবিরোধীরা। বাধ্য হয়ে সালেহা বেগমের পরিবার পার্শ্ববর্তী সুন্দরবনে আশ্রয় নেয়। এ সময় সাব-সেক্টর কমান্ডার জনাব জিয়াউদ্দিনের নেতৃত্বে তাঁর বাবাসহ ভাইয়েরা সবাই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর ভাই আলতাফ হোসেন (লেফট্যানেন্ট) কমান্ডার নিযুক্ত হন। তখন তাঁর ভাইয়ের সহযোগিতায় মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন ছালেহা। তিনি ভাইয়ের সঙ্গে ক্যাম্পে থাকতেন।

জুন মাসের প্রথম দিকে তিনি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। কমান্ডার আলতাফ এবং কমান্ডার বেলায়েত হোসেন তাঁর প্রশিক্ষক ছিলেন। থ্রি নট থ্রি রাইফেল, গ্রেনেড এবং বিভিন্ন বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহারে প্রশিক্ষণ নেন তিনি। প্রশিক্ষণ শেষে এস. এম. মনোয়ারা বেগম মনু (পটুয়াখালি) এবং আনোয়ারা বেগম আনুর (পটুয়াখালি) সাথে তাঁর দেখা হয় এবং মাঝে মাঝে তাঁরা একসঙ্গে কাজও করতেন।

ছালেহা সেবিকা, ইনফর্মার ও সশস্ত্রযোদ্ধা হিসেবে কাজ করেছেন। বয়স কম থাকায় এক ক্যাম্প থেকে অন্য ক্যাম্পে যোগাযোগ করা তাঁর জন্য ছিল খুব সহজ কাজ। বিভিন্ন খবরাখবর প্রদান ও অস্ত্র-শস্ত্র এক ক্যাম্প থেকে অন্য ক্যাম্পে আনা নেয়ার কাজ করতেন। কখনো কখনো সেবিকা হিসেবে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা শুশ্রূষা করেছেন তিনি। আবার কখনো মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য খাবার সংগ্রহ ও তাঁদের রান্না করে খাইয়েছেন। সশস্ত্রযোদ্ধা হিসেবে তিনি সরাসরি অংশগ্রহণ করেছেন দু'টি যুদ্ধে । একটা সশস্ত্র যুদ্ধে তাঁর অংশগ্রহণ সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'সুন্দরবনে একবার আক্রমণ হলো। কমান্ডারের নির্দেশে আমরা দ্রুত পজিশন নিলাম। প্লেন থেকে বোমা ফেলা হচ্ছিল। আমাদের প্রতি নির্দেশ এলো, আমরা যেন গুলি না ছুড়ি। কারণ আমাদের নিকট তখন এমন অস্ত্র ছিল না যা দিয়ে প্লেন ভূপাতিত করা যায়। উপর থেকে ব্যাপক বোমা বর্ষণ করা হচ্ছিল আর নৌপথে গানবোট থেকে শেল মারা হচ্ছিল। আমরা কোনোমতে ঝোপের মধ্যে একটা বাংকারে পজিশন নিয়েছিলাম। চারদিকে কানফাঁটা শব্দ। একদিন এক রাত আমরা ঐ অবস্থায় ছিলাম।'

আর একটা যুদ্ধের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিক হবে। পাকসেনারা গানবোট থেকে শেল এবং মেশিন গানের গুলি ছুড়ছে। আর আমরা উপকূলভাগে বাংকারের মধ্যে ছিলাম। ঐদিন আমি সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। গোলা বারুদ কয়েকটি বাংকারে পৌঁছিয়ে দিয়েছি মাত্র। অমনি মেশিনগানের গুলির শব্দ। আমি বাংকারে পজিশন নিলাম। সারাদিন যুদ্ধ হয়েছিল। ওই যুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাদের একটা লঞ্চ ডুবিয়ে দেয়া হয়। ঐ যুদ্ধে কমান্ডার ছিলেন আলতাফ হোসেন এবং বেলায়েত হোসেন। আমার যতটা মনে আছে, এই যুদ্ধের পূর্বে ম্যাপ দেখিয়ে দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন সাব-সেক্টর কমান্ডার মেজর জিয়াউদ্দিন। আমি পাশে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। উল্লেখ্য, ঐ সময় শুধুমাত্র কমান্ডারগণ উপস্থিত ছিলেন। সাধারণ যোদ্ধারা যেখানে উপস্থিত ছিলেন না।'

দেশ স্বাধীনের পূর্ব পর্যন্ত ছালেহা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন। দেশ স্বাধীনের পরে জানুয়ারি ১৯৭৬ সালে তাঁর বিয়ে হয়। বর্তমানে তিনি তিন ছেলে ও এক মেয়ের মা। এক ছেলে চাকুরি করে, দুই ছেলে পড়াশুনা করে। মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন। তাঁর স্বামী আঃ ছালাম আলফু মারা গেছেন। তিনি আফসোস করে বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে ত্রিশ বছর পূর্বে। ইতিপূর্বে কেউ এ বিষয়ে খোঁজ-খবর নেয় নি। মুক্তিযুদ্ধ করেছি, দেশ স্বাধীন হয়েছে কিন্তু সন্ত্রাসমুক্ত হয় নি।'

মোছাম্মৎ হালিমা খাতুন
(বাগেরহাট)

হালিমা খাতুনের সন্ধান পাই বাগেরহাটের নারী মুক্তিযোদ্ধা মেহেরুন নেছা মিরার নিকট থেকে। বাগেরহাট থেকে রওনা হলাম বেলা এগারটার দিকে। শহরের গা ঘেঁসে মনিগঞ্জ নদী। ভাটার সময় নদীতে থাকে তীব্র স্রোত। নদী পার হতে বেশ খনিকটা সময় লাগে। নদী পার হয়ে প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে হালিমার গ্রামের বাড়ির সন্ধান পাই। নানা প্রজাতির বৃক্ষরাজি হালিমার গ্রামটিকে ছায়া দিয়ে রেখেছে। খালের পাশ দিয়ে যেতে দুই একটি গোলপাতা গাছ চোখে পড়ে। রোদের তাপ তেমন ছিল না। পথ চলতে চলতে মনে পড়ে একাত্তরের দিনগুলোর কথা। এই শ্যামল গ্রামেও একাত্তরে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছিল। এই খাল দিয়ে ভেসে গেছে অগণিত লাশ। আজও এ গাঁয়ের কত মা তাঁর বুকের মানিকের স্মৃতি মনে করে করে কেঁদে ফেরে, চোখের নোনতা জলে বুক ভাসায়। বেলা দেড়টার দিকে হালিমার বাড়ি পৌঁছলাম। অনেক কথা হলো হালিমার সাথে।

মোছাম্মৎ হালিমা খাতুন ১৯৫২ সালে বাগেরহাট জেলার বেসরগাতি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা ওয়াহেদ আলী মীর এবং মাতা আয়তন নেছা। দুই ভাই ও চার বোনের মধ্যে তিনি বড়। হালিমার বাবা ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র; নিজের কৃষিক্ষেত থেকে যে আয় হতো তা দিয়ে কোনোমতে সংসার চালাতেন তিনি। ১৯৬৫ সালে হালিমার বিয়ে হয় একই গ্রামের সিরাজউদ্দিনের সাথে। ১৯৬৮ সালে তাঁর প্রথম সন্তান জন্ম নেয়। রাজনীতির জটিল সমীকরণ তিনি না বুঝলেও পাকিস্তানিদের নির্মম নির্যাতন সম্পর্কে তিনি জানতেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলেও সমাজ সচেতনতা তাঁর ছিল। ছিল অদম্য দেশপ্রেম।

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ সম্পর্কে তাঁর নিকট জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'একাত্তরে কুখ্যাত রাজাকার রজ্জব আলী ফকির ও পাকবাহিনী একযোগে বাগেরহাট অঞ্চলে ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ, লুট, নির্বিচারে হত্যা, নারী ধর্ষণের মতো জঘন্য কর্মে মেতে ওঠে। স্বচক্ষে দখলদার বাহিনীর বর্বর হত্যাযজ্ঞ, লুট, ধর্ষণ, নির্যাতন ও লাশ দেখে

আমার মন শক্ত হয়ে ওঠে। এসব অত্যাচার ও হত্যার প্রতিশোধের আগুন আমাকে বিচলিত করে।' মুক্তিযুদ্ধে 'হয় বাঁচব নয়তো মরব'— এই সংকল্পে দীক্ষিত হয়ে হালিমা এবং তার স্বামী মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য জুলাই মাসের শেষদিকে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার হাবিবুর রহমান হবির নিকট যান এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার হাবিবুর রহমান হবির দলে যোগ দেন। হাবিবুর রহমান হবি ছিলেন প্রাক্তন ইপিআর সদস্য। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি এলাকার যুবক-ছেলেদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দল গঠন করেন।

হালিমা খাতুন প্রাথমিক পর্যায়ে আগ্নেয়াস্ত্রের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। হাবিবুর রহমান হবি তাঁকে আগ্নেয়াস্ত্রের প্রশিক্ষণ দেন। গ্রেনেড ছোড়া ও বিভিন্ন বিস্ফোরক দ্রব্যের ব্যবহার সম্পর্কে তিনি পারদর্শী ছিলেন। প্রাথমিক পর্যায়ে ক্যাম্পে রান্নাবান্নার কাজ করতেন হালিমা। ক্রমে ক্রমে তিনি কমান্ডারের বিশ্বাস অর্জন করেন। ক্যাম্পে রান্না করা ছাড়াও বিভিন্ন ছদ্মবেশ ধারণ করে তথ্য আদান-প্রদান এবং যুদ্ধক্ষেত্রে গোলাবারুদ সরবরাহের কাজ করতেন হালিমা। হালিমার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে কমান্ডার তাঁকে ক্যাম্পের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিতেন। তিনি ছদ্মবেশ ধারণ করে বিষ্ণুপুর, দেপাড়া, কান্দাপাড়া, ব্যাসরগাতি, চিতলমারী এলাকায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আদান-প্রদান করতেন। কখনো কুলবধূ, কখনো ভিখারি আবার কখনোবা ফেরিওয়ালা হিসেবে এসমস্ত কাজ করেছেন।

দেশ পাকহানাদারমুক্ত হলেও দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পান নি হালিমা। বিভিন্ন বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে কোনোমতে অসুস্থ স্বামীকে নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। তাঁর এক ছেলে এবং এক মেয়ে। ছেলেমেয়েদের বিয়ে হয়েছে। তাঁর ছেলে অন্যের কৃষি জমিতে শ্রমিকের কাজ করেন। শ্রম দিয়ে তিনি যা পান তা দিয়ে তাঁর নিজের সংসার চলে না।

দেশ ও জাতির কাছে তার চাওয়া-পাওয়ার কিছুই নেই। মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করতে পেরেছিলেন বলে তিনি আনন্দিত ও গর্বিত। মুক্তিযোদ্ধারা যেভাবে অবহেলিত হচ্ছে আর স্বাধীনতাবিরোধীরা যেভাবে পুনর্বাসিত হচ্ছে তা দেখে হালিমা মর্মাহত।

জোছেন আরা সাত্তার
(মংলা)

এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯৪৭ সালের ১৮ ডিসেম্বর জোছেন আরা ছাত্তারের জন্ম হয়। জোছেন আরা ছাত্তারের পৈতৃক নিবাস বাগেরহাট জেলার সদর থানায়। তাঁর বাবা শেখ রাহেন উদ্দিন এবং মা জহুরা খাতুন। দুই ভাই ও ছয় বোনের মধ্যে জোছেন আরা চতুর্থ। অত্যন্ত সদালাপী এবং ধর্মভীরু জোছেন আরা ছাত্তার গৃহমায়া ত্যাগ করে দেশ মাতৃকার মুক্তির জন্য বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন।

জোছেন আরা ছাত্তারের কথা জানতে পারি সাপ্তাহিক মুক্তিবার্তা পত্রিকায় প্রকাশিত একটা তালিকা থেকে। সাপ্তাহিক মুক্তিবার্তা পত্রিকাটি প্রকাশিত হতো কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ থেকে। ২৬ ডিসেম্বর ২০০২ জোছেন আরা ছাত্তারের খোঁজে রওনা হই মংলার উদ্দেশে। বেলা দশটার সময় পৌঁছাই মংলা বন্দরে। নদী পার হয়ে অনেক খোঁজাখুঁজির পর সন্ধান পাই জোছেন আরা ছাত্তারের।

একাত্তরে জোছেন আরার বয়স চব্বিশ বছর। এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে পাকবাহিনীর নির্যাতন এবং মুসলিম লীগ ও জামাতের আস্ফালনে সাধারণ মানুষ মৃত্যুভয়ে তটস্থ। পোর্ট এলাকায় লাশের ওপর লাশ পড়ে থাকে। প্রায়ই রাতে এবাড়ি ওবাড়ি কান্নকাটির শব্দ আসে। লোকে সকালে শুনতে পায় পাশের বাড়ির মেয়েদের ধরে নিয়ে গেছে। প্রতি রাতে যাদের ধরে নিয়ে যায়, তারা আর ফিরে আসে না। তাদের কোথায় নিয়ে যায়— কেউ তা বলতে পারে না। জোছেন আরা চার সন্তানের মা হলেও শারীরিক গড়ন ছিল বেশ সুঠাম। তাই ভয়টা অন্যদের তুলনায় তার কম নয়। চারদিকে পাকবাহিনীর শোষণ এবং বর্বর নির্যাতনের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন তিনি। দেশ মাতৃকার মুক্তির জন্য শাশুড়ির নিকট নিজের কোলের সন্তানকে রেখে জোছেন আরা স্বামীর সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

৯নং সেক্টরের সাব-সেক্টর কমান্ডার মেজর জিয়াউদ্দিনের অধীনে তিনি এবং তাঁর স্বামী মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। রাইফেল ও গ্রেনেড চালানো প্রশিক্ষণ নেন জোছেন

আরা। তাঁকে প্রশিক্ষণ দেন তাঁর স্বামী আব্দুস ছাত্তার হাওলাদার এবং শেখ আঃ জলিল। এই আঃ জলিল ছিলেন তাঁর কমান্ডার। ক্যাম্প ছিল শেওলাবুনিয়া। এই শেওলাবুনিয়া ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ নেন তিনি। এছাড়া তিনি ছদ্মবেশ ধারণ বিষয়ক প্রশিক্ষণও গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অত্যন্ত আন্তরিক। দক্ষতার সাথে একমাসের প্রশিক্ষণ শেষ করেন তিনি।

বেশিরভাগ সময় ক্যাম্পে থেকেছেন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জোছেন আরা। তিনি ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধদের জন্য রান্না করেছেন এবং আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা-শুশ্রুষা করেছেন। তিনি ক্যাম্পে অস্ত্রশস্ত্র রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করেছেন। মুক্তিযোদ্ধারা বাইরে গেলে তিনি কখনো কখনো ক্যাম্প পাহারা দেয়ার কাজ করেছেন। বিভিন্ন ছদ্মবেশ ধারণ করে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে তার জুড়ি মেলা ভার। প্রত্যেকটি কাজে তিনি অত্যন্ত দক্ষতা ও আন্তরিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিশ্বস্ত। সকল মুক্তিযোদ্ধা তাঁকে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করতেন। গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য বহুবার প্রশংসিত হয়েছেন তিনি।

বর্তমানে তিনি স্বামীর সংসার করছেন। তিনি থাকেন মংলা শহরে। তাঁর দুই ছেলে এবং তিন মেয়ে। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পেরে তিনি গর্বিত। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য পরিবারের সকলে তাঁকে শ্রদ্ধা করে। মুক্তিযোদ্ধাদের যথাযথ মূল্যায়ন করার জন্য তিনি সকলকে আহবান জানান। নতুন প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হোক— এই তাঁর প্রত্যাশা।

জোহ্‌রা খাতুন
(ভোলাহাট)

আগস্টের শেষ দিক হবে গিলাবাড়ি অস্থায়ী হাসপাতালে প্রতিদিন শত শত আহত মুক্তিযোদ্ধা আসতে থাকে। এ সময় আহতদের হাসপাতালে জায়গা দেয়া খুবই সমস্যা হচ্ছিল। আবার চিকিৎসার জন্য নার্স ও চিকিৎসা সরঞ্জামাদি ছিল চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। এ সময় হাসপাতালে সেবিকা হিসেবে কাজ করার জন্য একটু শিক্ষিত মেয়েদের খোঁজ করা হচ্ছিল শরণার্থী শিবিরগুলোতে। তিনি তখন তাঁর ভাইয়ের সহযোগিতায় কমান্ডার হাফিজউদ্দিন হাসনুর সাথে দেখা করেন। অক্টোবর মাসের দিকে কমান্ডার হাসনুর অনুমতি নিয়ে তিনি গিলাবাড়ি ক্যাম্পে নার্স হিসেবে যোগদান করেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে অন্যান্যদের মধ্যে আরো ছিলেন মেহেরুন নেছা, মেহেরুন নাহার, সামসুন নাহারসহ অনেকে। এভাবেই মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন বীর মুক্তিযোদ্ধা জোহ্‌রা খাতুন।

মুক্তিযোদ্ধা জোহুরা খাতুনের সন্ধান পাই তাঁর সহযোদ্ধা সামসুনের নিকট থেকে। তাঁর গ্রামের বাড়ি থেকে প্রাপ্ত ঠিকানা অনুযায়ী রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাঁর সঙ্গে কথা হয়। অত্যন্ত সদালাপী এবং স্পষ্টভাষী জোহ্‌রা খাতুন।

জোহুরা খাতুনের জন্ম সাত জুন ১৯৫৫ সালে, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ভোলাহাট থানার বজরাটেক গ্রামে। তাঁর বাবা খান মোহম্মদ এবং মা জয়নব বেগম। ছয় ভাইবোনের মধ্যে জোহ্‌রা খাতুন চতুর্থ।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবদান সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান, পারিবারিকভাবে তিনি ছিলেন রাজনীতি সচেতন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তিনি ছিলেন একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী। পাশের থানা গোমস্তাপুরে পাকবাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকার আলবদররা সীমাহীন নির্যাতন চালাচ্ছিল। হাজার হাজার মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে শরণার্থী হিসেবে ভারতে আশ্রয় নিচ্ছে। জ্বালিয়ে দিচ্ছে নিরাপরাধ মানুষের ঘরবাড়ি। নির্যাতন চালাচ্ছে নারীদের ওপর। পাকবাহিনী ও তাদের দোসরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন মূলত একজন নার্স হিসেবে।

নার্স হিসেবে প্রথম প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন বাংলাদেশের গিলাবাড়ি এবং পরে ভারতে আদমপুর ক্যাম্পে। পনের দিনের একটা প্রশিক্ষণ কোর্স শেষ করে তিনি কাজ শুরু করেন। নার্স হিসেবে তাঁদের প্রশিক্ষণ হয় মূলত হাতে-কলমে। ডাক্তার বকুল, ডাক্তার বিপেন, ডাক্তার জসির নিকট থেকে তিনি নার্সিং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। নার্সিং প্রশিক্ষণের পাশাপাশি তাঁকে আগ্নেয়াস্ত্রের প্রশিক্ষণও দেয়া হয়। আলতাফ হোসেন ও নিজাম উদ্দিন তাদের আগ্নেয়াস্ত্রের প্রশিক্ষণ দেন।

হাসপাতালে সাধারণত আহতদের ক্ষতস্থান পরিষ্কার করা, ব্যান্ডেজ করা, নিয়মিত ঔষধ খাওয়ানোর কাজ করেন তাঁরা। এছাড়া অপারেশনের সময়ও তিনি ডাক্তারদের সাথে থেকে অপারেশনের কাজে সহযোগিতা করেছেন। অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি গুরুত্বের সাথে তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছেন এবং প্রশংসিত হয়েছেন।

একাত্তরের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'অতি নিকট থেকে আহত যোদ্ধাদের আর্তনাদ শুনেছি এবং কষ্ট দেখেছি। দ্রুত সুস্থ হয়ে যুদ্ধে যোগদানের জন্য ছটফট করেছে আহত যোদ্ধারা। গালি দিয়েছে রাজাকারদের। তাঁদের কষ্টে আমি অনেকবার কেঁদেছি, আবার তাঁদের মনোবল দেখে বিস্মিত হয়েছি। যা আমি কখনো ভুলব না।'

তিনি আরো বলেন, 'দেশ স্বাধীন হয়েছে। ছেলেরা ঘরে ফিরেছে। আর মেয়েরা ঘরে ফিরলে তাঁদের বেলায় জুটেছে ঘৃণা। মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য সমাজ থেকে সইতে হয়েছে অনেক গঞ্জনা, অনেক বাজে কথা। এখনো মুক্তিযোদ্ধা বলতে পুরুষদের বোঝায়। আর নারী মুক্তিযোদ্ধা বলতে এ সমাজ বোঝে বীরাঙ্গনা হিসেবে।'

মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে পেরে তিনি গর্বিত। মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য এখন পরিবারের সকলে তাঁকে শ্রদ্ধা করে।

মুক্তিযুদ্ধের বত্রিশ বছর পর আজ দেশের সার্বিক অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'আমরা যুদ্ধ করেছি। স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে কিন্তু মুক্তি পাই নি। আমি চাই রাজাকারমুক্ত, সন্ত্রাসমুক্ত একটি অসাম্প্রদায়িক দেশ।'

মমোতাজ
(রংপুর)

আকলিমা খন্দকার ও মাহমুদা ইয়াসমিনের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জনকণ্ঠের সাংবাদিক মানিক দা'র সহযোগিতায় ১৪ ফেব্রুয়ারি খুঁজে পাই মুক্তিযোদ্ধা মমোতাজ পারভীনকে। রংপুর শহরতলীর কামালগাছনা এলাকায় বসবাস করেন মমোতাজ পারভীন। অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে তিনি আমাদের গ্রহণ করেন। কথা বলি মমোতাজ পারভীনের সাথে।

মমোতাজ পারভীনের জন্ম ১৯৫৭ সালের ২৮ নভেম্বর গাইবান্ধা জেলার বোনারপাড়া গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে। চার ভাই ও ছয় বোনের মধ্যে তিনি পঞ্চম। বাবা ময়েজ উদ্দিন আহম্মদ ও মা নূরজাহান বেগমের নয়নের মণি মমোতাজ। ছোটবেলা থেকে মমোতাজ দেখতে যেমন সুন্দর তেমনি শান্ত। তাঁর বাবা রেলওয়ে বিভাগে চাকুরি করতেন। চাকুরির সুবাদে তাঁকে বিভিন্ন জায়গায় বদলি হতে হয়েছে। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মমোতাজ পারভীন দশম শ্রেণীর ছাত্রী এবং তখন তাঁর বাবার সাথে লালমনিরহাটে থাকেন।

একাত্তরে মার্চের প্রথম দিকে অবাঙালি বিহারিরা বাঙালিদের ওপর ভেতরে ভেতরে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ৭ মার্চ '৭১ বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পর লালমনিরহাটে বিহারিরা আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠে। ২৫ মার্চ রাতে ঢাকায় গণহত্যা শুরুর পরে বিহারিদের কার্যক্রম অনেকটা বাঙালি হটাও কার্যক্রমের মতো চলতে থাকে। রেলস্টেশনের কাছে মমোতাজদের বাসা। বিহারিদের বেশিরভাগই থাকতেন রেলস্টেশনের কাছাকাছি জায়গায়। তাই বিহারিদের তাণ্ডব অনেকের চেয়ে মমোতাজের নিকট বেশি স্পষ্ট হয়েছিল। পাকবাহিনী ও বিহারিরা যখন বাঙালিদের ওপর অত্যাচার শুরু করে, তখন মমোতাজ নিরাপত্তার অভাবে কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়িতে তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়িতে চলে যান। ফুলবাড়িতেও নিরাপত্তার অভাব বোধ করেন মমোতাজের পরিবার। পরে এপ্রিল মাসের ১০/১২ তারিখের দিকে তারা প্রথমে ভারতের সাহেবগঞ্জ ও পরে কোচবিহার জেলার দিনহাটা তাঁর দাদাবাড়িতে চলে যান। এরই

মধ্যে তার এক বান্ধবী শামিমা আক্তার গিনির সাথে দেখা হয়। গিনি তখন মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে কাজ করছিলেন।

বাংলাদেশের বুড়িমারির সীমান্তের ওপাশে ভারতের চ্যাংড়াবান্ধা ক্যাম্প ও অস্থায়ী হাসপাতাল। সেপ্টেম্বরের দিকে অসংখ্য যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা হাসপাতালে আসতে থাকে। চাহিদার তুলনায় নার্স, ডাক্তার বা চিকিৎসা সামগ্রী ছিল না বললেই চলে। এ সময় ৬ নং সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার জনাব এম.কে বাশারের নির্দেশে শরণার্থী শিবিরগুলো থেকে একটু শিক্ষিত মেয়েদের খোঁজ করা হচ্ছিল নার্সিংয়ের কাজের জন্য। তখন তিনি তাঁর বান্ধবী গিনির ভাই বাচ্চুর সহযোগিতায় মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন।

পনের দিনে নার্সিং কোর্স শেষ করে নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি তিনি নিয়মিত কাজে যোগদান করেন। তাকে নার্সিং প্রশিক্ষণ দেন ডা. মতিউর রহমান। নার্সিং কাজের পাশাপাশি তিনি আগ্নেয়াস্ত্রেরও প্রশিক্ষণ নেন। আগ্নেয়াস্ত্রের প্রশিক্ষণ দেন ক্যাপ্টেন মতিন। সিদ্ধান্ত ছিল তাঁদের আরো ভারী অস্ত্রের প্রশিক্ষণ দেয়ার, কিন্তু দেশ দ্রুত স্বাধীন হয়ে যাওয়াতে তাঁদের আর ভারী অস্ত্রের প্রশিক্ষণ নেয়া হয় নি।

মমোতাজ তাঁর কাজের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'ওই সময় মুক্তিযোদ্ধাদের যে শক্তিশালী মনোবল, সাহস আর দেশপ্রেম দেখেছি, তা এখন আর দেখা যায় না। আমার স্পষ্ট মনে আছে ১২-১৩ বছর বয়সের একটি ছেলের কথা। ছেলেটির পায়ে গুলি লেগেছে। অপারেশনের সময় আমি উপস্থিত। ছেলেটা জ্ঞান ফিরতেই যুদ্ধে যাবার জন্য উঠতে যাচ্ছিল। সে ভুলেই গিয়েছিল যে সে অসুস্থ। সিট থেকে নামতে গেলে আমরা ধরে ফেললাম। বললাম, তুমি করো কী ? তুমি অসুস্থ ! ছেলেটা চিৎকার করে বলতে লাগল, আমাকে ছেড়ে দিন। আমার ভাইকে ওরা মেরে ফেলবে! পরে জানতে পারলাম যুদ্ধক্ষেত্রে সে গুলিবিদ্ধ হয় এবং প্রচুর রক্তক্ষরণের পরে জ্ঞান হারায়। তাঁর ভাই তখনো পাকসেনাদের সাথে সম্মুখযুদ্ধে রত ছিল। পরে মেজর নওয়াজেসের আরেকটি শক্তিশালী দল মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধে যোগ দিলে পাকসেনারা পালিয়ে যায়।'

নার্স হিসেবে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষতস্থান পরিষ্কার করা, ব্যান্ডেজ করা, ইনজেকশন পুশ করা, ঔষধ খাওয়ানো ছিল তাঁর প্রধান কাজ। এছাড়া অপারেশনের সময় ডাক্তারদের সাথে থেকে অপারেশন কাজে সহযোগিতা করতেন তিনি। তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব তিনি অতি গুরুত্বের সাথে পালন করতেন। এজন্য ডাক্তাররা তাঁর কাজের প্রশংসা করতেন। এছাড়া যে সমস্ত মেয়েরা তাঁর সঙ্গে কাজ করতেন তাঁদের মধ্যে শামীমা আক্তার গিনি, পেয়ারী, আকলিমা খন্দকার, মাহমুদা ইয়াসমিন অন্যতম। এরপর লালমনিরহাট স্বাধীন হলে তিনি লালমনিরহাট অস্থায়ী হাসপাতালে কাজে যোগ দেন।

মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবদানের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন— দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে তিনি তাঁর পরিবারে ফিরে আসেন। ১৯৭২ সালে তিনি এসএসসি পাশ করেন এবং ১৯৭৩ সালে কামালগাছনার জনাব গোলাম মোস্তফার সাথে তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। বর্তমানে তিনি দু'সন্তানের জননী।

মুক্তিযোদ্ধাদের বর্তমান অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন— 'মুক্তিযোদ্ধারা আজ নিগৃহীত এবং মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। আমরা যুদ্ধ করেছিলাম সমতার জন্য। অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির জন্য কিন্তু মুক্তি এখনো আসে নি। তাই আর একটা মুক্তিযুদ্ধ প্রয়োজন।' মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পেরে মমোতাজ পারভীন গর্বিত।

এস.এম. মনোয়ারা বেগম মনু
(পটুয়াখালি)

ষাটের দশকের শেষভাগের রাজপথের লড়াকু ছাত্রী এস.এম. মনোয়ারা বেগম মনু। সভা-সমাবেশ ও মিছিলে তাঁর অংশগ্রহণ ছিল নিয়মিত। রাজনৈতিক আন্দোলনের সুবাদে বড় বড় রাজনীতিবিদদের সাথে পরিচয় ঘটে তাঁর।

আপন বড় ভাই, প্রজ্ঞাবান রাজনীতিবিদ অ্যাডভোকেট সরদার আব্দুর রশিদ এবং খ্যাতনামা রাজনীতিবিদদের সান্নিধ্যে মনোয়ারা দিনে দিনে হয়ে ওঠেন রাজনীতি সচেতন। তদানীন্তন পাকিস্তানি রাজনীতির জটিল সমীকরণ দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে যায় মনোয়ারা বেগম মনুর নিকট।

এস.এম. মনোয়ারা বেগমের জন্ম ১৯৫৩ সালের ১৪ মার্চ নিজ পিতৃলয়ে। তার পৈতৃক নিবাস পটুয়াখালি জেলার কলিকাপুর ইউনিয়নের টাউন কালিকাপুর গ্রামে। বাবা শরিফ হোসেন। মা সোনাভান বিবি। কলিকাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। ১৯৬৯ সালে পটুয়াখালি সরকারি গার্লস স্কুল থেকে এসএসসি পাশ করেন। উনসত্তরের গণআন্দোলন, সত্তরের নির্বাচন এবং একাত্তরের মার্চের উত্তাল দিনে প্রত্যেকটি আন্দোলনের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন দক্ষিণ বঙ্গের এই লড়াকু ছাত্রী।

একাত্তরের পঁচিশে মার্চ রাতে ঢাকায় গণহত্যা শুরু হয়। ২৬ মার্চ বরিশালে সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় পটুয়াখালিতে মনোয়ারা ও তাঁর সহযোদ্ধারা ঐক্যবদ্ধ হন। মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য শুরু হয় নানান তৎপরতা ।

পাকবাহিনীর মেজর নাদের পারভেজ পটুয়াখালি অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন এপ্রিল মাসের শেষদিকে। মেজর নাদের পটুয়াখালি অঞ্চলে নির্বিচারে হত্যা নারী ধর্ষণ, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়ার কাজে লিপ্ত হন। শহীদের রক্তে রঞ্জিত হয়ে ওঠে সারা দেশ। নদীতে দেখা যায় হাজার হাজার ভাসমান লাশ। ভেঙে পড়ে জনজীবন।

মেজর নাদেরের ভয়ে তটস্ত সবাই। 'মনুদের আশ্রয় দেয়ায়, পাছে যদি কিছু হয়'— এ ভয়ে সন্ত্রস্ত সকল নিরীহ মানুষ। ন্যূনতম আশ্রয়টুকু জোটে না মনোয়ারা

বেগম মনুর। বাধ্য হয়ে চলে যান সুন্দরবনের জঙ্গলে। মনুর বড় ভাই সরদার আঃ রশিদ, তাঁর ছোট বোন আনোয়ারা বেগম আনুসহ এলাকার অনেক সহযোদ্ধাদের সাথে মনু মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন। তিনি ৯নং সেক্টরের সাব-সেক্টর কমান্ডার মেজর জিয়াউদ্দিনের আওতায় ছিলেন।

ইসমাইল মিঞা নামের একজন অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকের কাছে মনোয়ারা প্রথম প্রশিক্ষণ নেন। এরপর বাগেরহাট জেলার শরণখোলাতে প্রশিক্ষণ নেন আফজাল হোসেনের নেতৃত্বে। রাইফেল, স্টেনগান, গ্রেনেড, রিভলবার এবং এসএমজি চালানোতে এত পারদর্শী হয়ে ওঠেন যে, দুই হাতে দু'টি অস্ত্র নিয়ে একই সময়ে নির্দিষ্ট নিশানায় গুলি ছুড়তে পারতেন মনোয়ারা।

মেজর জিয়াউদ্দিনের নেতৃত্বে প্রতিটি যুদ্ধক্ষেত্রে সফলতার পরিচয় দেন মনোয়ারা। সুন্দরবন ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা শরণখোলা, রায়েন্দা, নামাজপুর, কাকচিরা, ডোবাতলা, পটুয়াখালিসহ বিভিন্ন জায়গায় জিয়াউদ্দিনের নির্দেশে এবং নেতৃত্বে সরাসরি যুদ্ধ করেন এবং কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। মনোয়ারা বেগম পটুয়াখালিতে পাকসেনাদের বিরুদ্ধে সরাসরি সশস্ত্র যুদ্ধে জয়লাভ করেন এবং রাজাকারদের তিনটি ক্যাম্প দখল করেন। দখলকৃত ক্যাম্প থেকে প্রচুর গোলাবারুদ এবং নির্যাতিত মেয়েদের উদ্ধার কাজে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখেন এই অসীম সাহসী নারী মুক্তিযোদ্ধা।

পরাজয়ের গ্লানিতে মেজর নাদেরের মামা চড়কগাছ। দিশাহারা নাদের বারো জনের একটি তালিকা তৈরি করে এবং বারোজনকে গুলির নির্দেশ দেয়। এদের মধ্যে মনুরা তিন ভাই-বোনের ১-২-৩ নাম্বার, ৪ নাম্বারে ছিলেন প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু। এক এবং দুই নং ক্রমিক আনু আর মনুর জন্য পুরস্কার ঘোষণা দেয়া হয়। 'আনু এবং মনুকে জীবিত অথবা মৃত ধরিয়ে দিলে ৫০,০০০ টাকা এবং এক সের স্বর্ণ পুরস্কার দেয়া হবে।' মেজর নাদেরের ঘোষণায় গর্জে ওঠেন মনোয়ারা বেগম। দীপ্ত শপথে খামচে ধরেন অস্ত্র। সীমাহীন মনোবল এবং জিয়াউদ্দিনের কৌসুলী নেতৃত্বে প্রতিটি যুদ্ধে জয়লাভ করেন তাঁরা। পরাজয়ে কুরে ওঠে মেজর নাদের। আনু-মনুকে ধরতে না পেরে, পঞ্চাশোর্ধ্ব মনোয়ারার মা সোনাভানকে ধরে আনে। পাকসেনারা মানসিক নির্যাতন চালায় বৃদ্ধার ওপর। পাকসেনারা তাঁর বড়বোনের সংসার ধ্বংস করে এবং মনোয়ারার ভগ্নিপতিকে গুলি করে নির্মমভাবে হত্যা করে। মনোয়ারার বোনের মেয়েকে তার মায়ের সামনে হত্যা করে। পাকবাহিনীর নির্মম নির্যাতন থেকে মনোয়ারার কোনো আত্মীয়স্বজন পর্যন্ত রেহাই পায় নি। পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্যকে ক্ষতবিক্ষত করেছে হায়নার দল।

পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্যকে এত নির্যাতন, অত্যাচার, হত্যা কোনো কিছুই এক বিন্দু টলতে পারে নি মনোয়ারাকে। দেশমাতৃকার মুক্তির মন্ত্রে দিক্ষিত মনোয়ারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অনড়। বজ্র কঠিন শপথে মনোয়ারা একের পর এক শত্রুবক্ষ ঝাঝরা করছে। তাঁর বুলেটের আঘাতে পাকসেনারা নিক্ষিপ্ত হয়েছে মৃত্যুর কোলে।

অবশেষে দেশ স্বাধীন হলো। সবাই ঘরে ফিরল। মায়ের স্নেহের ছায়ার তলে তাঁরা মাথা গুঁজল। ফিরে এলো না মনোয়ারার বোনের মেয়ে, ফিরে এলো না মনোয়ারার ভগ্নিপতি। আজও সন্তানহারা মা কেঁদে ফেরে শূন্য বুকে। স্বামী হারা বোন, স্বামী বিরহে পাগলিনী প্রায়। তবুও সান্ত্বনা মনোয়ারার— দেশ স্বাধীন হয়েছে, তিনি মুক্তিযুদ্ধ করেছেন।

দেশ স্বাধীনের পরে পটুয়াখালি মহিলা কলেজ থেকে ১৯৭২ সালে এইচএসসি পাশ করেন। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৬ সালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্স এবং পরে মাস্টার্স পাশ করেন। জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, জাতীয় পুষ্টি পরিষদ, জাতীয় অন্ধসংস্থা, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি, আইন-শৃঙ্খলা ও মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কমিটিসহ বহু সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত মনোয়ারা বেগম। বর্তমানে সমবায় অধিদপ্তরের আওতায় থানা কর্মকর্তা হিসেবে, দশমিনা থানায় কর্মরত আছেন মুক্তিযোদ্ধা মনোয়ারা বেগম।

মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনাকে ধারণ করে অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি অর্জনের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের উদ্দেশ্য সফল করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন গর্বিত নারী— মুক্তিযোদ্ধা মনোয়ারা বেগম।

সাহিদা বেগম
(যশোর)

সাহিদা বেগম যশোরের কাজীপাড়ায় তাঁর পিত্রালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার, মা মমতাজ আরা বেগম। বাবা প্রগতিশীল চেতনার পুলিশ কর্মকর্তা, মা গৃহিণী। আট ভাইবোনের একজন সাহিদা বেড়ে উঠেছেন এক অবাধ সাংস্কৃতিক পরিবেশে। কৈশোরে সাহিদা ছিলেন ভীষণ চটপটে। সাহিদার শিক্ষাজীবন শুরু হয় যশোরে। স্কুলজীবনের মধ্যভাগেই সাহিদা চলমান রাজনীতি সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। দেশ, মানুষ আর প্রকৃতির প্রতি অগাধ ভালোবাসা সাহিদার রাজনীতিতে অংশগ্রহণ অনিবার্য করে তোলে। যশোরে মহিলা কলেজে পড়ার সময় তিনি ছাত্রলীগের সভাপতি নির্বাচিত হন।

যশোরে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই সাহিদাদের প্রস্তুতি শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের। সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের গোপন সংগঠন নিউক্লিয়াস গঠন করা হয় কেন্দ্রীয়ভাবে। কেন্দ্রীয় নিউক্লিয়াসের আদলে যশোরেও নিউক্লিয়াস গঠন করা হয়। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় যশোর এলাকার মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি এবং মুক্তিযুদ্ধের পরিচালনা ছিল একটু ভিন্ন ধরনের এই কারণে যে, যশোর নিউক্লিয়াসের আওতায় গোপন ট্রেনিং ইউনিট গঠন করা হয়। সাহিদা বেগম এই সংগঠনের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন। বেচপাড়া কবরস্থানের দক্ষিণ কোণে আব্দুর রশিদ সাহেবের বাগানবাড়িতে ট্রেনিংয়ের কার্যক্রম চালানো হতো। অনেকটা গোপন আর কৌশলগত অবস্থানে থাকার কারণে এই বাড়িটিকেই বেছে নেয়া হয় ট্রেনিং ইউনিট হিসেবে। সেনা এবং বিমান বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ তরুণ ছেলেমেয়েদের প্রশিক্ষণ দিয়ে চৌকস যোদ্ধায় পরিণত করেন।

ট্রেনিং ইউনিটের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত থেকে রাইফেল, গ্রেনেড ও নানান ধরনের বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহারের সফল প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন সাহিদা। একই সময় দেয়া হয় তাঁকে ছদ্মবেশ ধারণের বিভিন্ন কৌশল বিষয়ক প্রশিক্ষণ। সাহিদা প্রশিক্ষণের প্রত্যেকটি বিয়য়ে ছিলেন অত্যন্ত আন্তরিক। প্রশিক্ষণকালে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দেন তিনি।

যুদ্ধকালীনসময়ে ইনফর্মারের দায়িত্ব পালন করেছেন কৃতিত্বের সাথে। তাঁর প্রধান কাজ ছিল যশোর এবং খুলনার বিভিন্ন জায়গায় গোপনে অস্ত্র সরবরাহ করা। বাবা পুলিশের ডিএসপি হওয়াতে অস্ত্র সরবরাহ তার জন্য অনেকটা নিরাপদ ও সহজ হয়েছিল। ইনফর্মারের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অনেকবার চ্যালেঞ্জের মুখে পড়লেও কৌশলে তা মোকাবেলা করেছেন সাহিদা। দায়িত্ব পালনের প্রত্যেকটি পর্বে তিনি কমান্ডারের নির্দেশ নিখুঁতভাবে পালন করতেন। তিনি ছিলেন সকল মুক্তিযোদ্ধার স্নেহভাজন।

বর্তমানে বিমানের জুনিয়র সেলস্ অফিসার হিসেবে কর্মরত সাহিদা বেগম। স্বামী এস. এম. ফজলুর রহমানের সাথে শান্তির নীড় গড়লেও স্বাধীন দেশের মুক্তিহীন মানুষ আর অধঃপতিত সমাজের চিত্র দেখে তিনি বিক্ষত হচ্ছেন প্রতিনিয়ত।

এই প্রজন্মের প্রতি মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনায় সমাজ বিনির্মাণের আহ্বান জানিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ত্যাগকে সার্থক করে তোলার আবেদন জানান বীর মুক্তিযোদ্ধা সাহিদা বেগম।

সামসুন্নাহার
(ভোলাহাট)

কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল, বাঙলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ থেকে প্রকাশিত 'সাপ্তাহিক মুক্তিবার্তা' থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মুক্তিযোদ্ধা সামসুন্নাহারের খোঁজে রওনা হই ভোলাহাটের উদ্দেশে। দেখি মাইলের পর মাইল আম বাগান। যেন ছাতার মতো ছায়া দিয়ে রেখেছে ভোলাহাটবাসীকে। ভেবে অবাক হই না যে, একদিন এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জায়গাটি মুক্তিযোদ্ধাদের পদচারণে দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। পরিণত হয়েছিল রণক্ষেত্রে। যে যুদ্ধ জয়ের শেষে আসে স্বাধীনতা।

ভারতের সীমান্তবর্তী চাঁপাইনবাবগঞ্জ। এ জেলার ভোলাহাট থানার গোহালবাড়ি ইউনিয়নের বজরাটেকে সামসুন্নাহারের জন্ম ১৬ জানুয়ারি ১৯৫৬ সালে। তাঁর বাবা মোগলা মাহলত ছিলেন কৃষক এবং মা সুফিয়া বেগম গৃহিণী। তাঁরা দুই ভাইবোন। তিনি বড়।

একাত্তরে সামসুন্নাহার ছিলেন দশম শ্রেণীর ছাত্রী। 'পাকিস্তানিরা বাঙালিদের শোষণ ও শাসন করছে'— এই সহজ কথাটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন পঞ্চদশী সামসুন্নাহার। এপ্রিলের শেষদিকে তিনি জানতে পারেন— পাকহানাদার বাহিনী ঘিরে ফেলছে বাংলার সকল জনপদ, জ্বালিয়ে দিচ্ছে গ্রামের পর গ্রাম। পাকবাহিনী ও তাদের দোসর কুলাঙ্গার রাজাকারদের সহযোগিতায় হত্যা, নির্যাতন করছে নিরীহ বাঙালিদের।

ভোলাহাটের পূর্বপাশের থানা গোমস্তাপুরেও পাকবাহিনী স্থায়ী ঘাঁটি স্থাপন করে। সেখান থেকে ভোলাহাট থানার গ্রামের পর গ্রাম আক্রমণ চালায়, জ্বালিয়ে দেয় ঘরবাড়ি। হত্যা করে নিরীহ গ্রামবাসীকে। পাকিস্তানিদের এসব তাণ্ডবে ক্ষিপ্ত ও প্রতিবাদী হন সামসুন্নাহার। তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য উপায় খুঁজতে থাকেন।

ভোলাহাট থানার গিলাবাড়িতে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প এবং অস্থায়ী হাসপাতাল ছিল। আগস্ট মাসের দিকে অস্থায়ী হাসপাতালে আহত মুক্তিযোদ্ধারা ভর্তি হতে থাকে। চিকিৎসা কাজে সহযোগিতার জন্য এলাকায় শিক্ষিত মেয়েদের খোঁজ করা

হচ্ছিল। সামসুন্নাহার, মর্জিনা ও সুরাইয়া বেগমের সহযোগিতায় ৭ নং সেক্টর এলাকার ৩ নং সাব সেক্টর কমান্ডারের অধীনে ক্যাম্প কমান্ডার হাফিজ উদ্দিন হাসনুর নিকট যান এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। কমান্ডার হাফিজউদ্দিন হাসনু সামছুন্নাহারের আগ্রহে তাঁকে মুক্তিযুদ্ধে নার্স হিসেবে কাজে যোগদানের অনুমতি দেন। হাসনুর অনুমতি পেয়ে সামসুন্নাহার নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন।

সামসুন্নাহার নার্সিং প্রশিক্ষণ নেন গিলাবাড়ি ও ভারতের মালদহ জেলার আদমপুর ক্যাম্পে। ডাক্তার জসি ও ডাক্তার বিপেন তাঁদের নার্সিং প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষক ছিলেন। তাঁদের নার্সিং প্রশিক্ষণ হয় হাতে-কলমে। নার্সিং প্রশিক্ষণের পাশাপাশি তিনি আগ্নেয়াস্ত্রের প্রশিক্ষণও গ্রহণ করেন। আগ্নেয়াস্ত্রের মধ্যে ছিল গ্রেনেড ও রাইফেল। নিজামুদ্দিন নেজা ও কমান্ডার হাসনু তাদের এই প্রশিক্ষণ দেন। আগ্নেয়াস্ত্রের প্রশিক্ষণ নেন যে-কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য এবং প্রয়োজনে পাক আর্মির আকস্মিক আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য।

নার্স হিসেবে তিনি যে-সমস্ত ডাক্তারদের সাথে কাজ করেন তাদের মধ্যে ডাক্তার জসি, ডাক্তার বিপেন ও ডাক্তার ইয়াসিন অন্যতম। আহত মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষতস্থান ব্যান্ডেজ করা, ইনজেকশন পুশ করা, ঠিকমতো ঔষধ খাওয়ানোর কাজ করতেন তিনি। আহতের অবস্থা খারাপ হলে ডাক্তারদের তত্ত্বাবধানে জরুরিভিত্তিতে সাগরদিঘি বা মালদহ সরকারি হাসপাতালে পাঠানো হতো । দেশ স্বাধীনের পূর্ব পর্যন্ত তিনি তাঁর দায়িত্ব অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে পালন করেন। স্বাধীনতার স্বপ্ন তাঁকে যে-কোনো কাজে উদ্বুদ্ধ করে।

একাত্তরে পাকসেনাদের নিষ্ঠুর নির্যাতনের একটি দৃশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'গোমস্তাপুর থানা হানাদার মুক্ত হওয়ার পরের দিন আমরা কয়েকজন নার্স সশস্ত্রযোদ্ধাদের সাথে রণাঙ্গন দেখতে গেলাম গোমস্তাপুর থানার রহনপুর নামক স্থানে। রহনপুর রণাঙ্গনে পাকিস্তানিদের বাংকারের নিকট যেতেই চোখে পড়ল বীভৎস দৃশ্য। বাংকারের সেই দৃশ্য দেখে আমি আঁতকে উঠি। বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে। বাংকারের সেই দৃশ্য মনে পড়লে এখনো বুকের ভেতরটা মোচড় দেয় আমার। মেয়েদের চুলের গোছা, চুলের বেণি, মাথার ফিতা, পায়ের নূপুর, ছিন্নবিচ্ছিন্ন জামা কাপড় বাংকারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখেছি। যুদ্ধ চলাকালে নরপশুরা মেয়েদের ওই বাংকারে রেখেছে। বাংকারের ভেতরে বসেই তাঁদের নির্যাতন করেছে। নারীকে ওই সমস্ত বাংকার এবং ক্যাম্পে নিজেদের জীবন বিসর্জন দিতে হয়েছে। ওই সমস্ত কথা মনে হলে এখনো আমার শরীর অবশ হয়ে আসে।'

তিনি কান্নাজড়িত কণ্ঠে আরো বলেন, 'ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্ত এবং আড়াই লক্ষ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে অর্জিত এই স্বাধীন সোনার বাংলাদেশ। কিন্তু যাদের ইজ্জতের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেলাম তাদের ত্যাগ এবং ইচ্ছার কতটুকু

বাস্তবায়িত হয়েছে? সেই সমস্ত অত্যাচারী আজ জোট সরকারের শরিক। তাদের গাড়িতে পতাকা ওড়ে। আজও সন্তানহারা মায়ের দীর্ঘশ্বাস আকাশবাতাস ভারি করে। যে সমস্ত নারী অসীম সাহসে স্বাধীনতার জন্য জীবন দিয়েছেন কিংবা যাঁরা প্রতিনিয়ত নির্যাতন সহ্য করেছেন তাঁদের ত্যাগের মূল্য দেয় নি এ দেশ।'

স্বাধীনতার পরে সামসুন্নাহার এসএসসি পাশ করেছেন। একাত্তরের নার্সিং কাজের সুবাদে ভোলাহাট স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পরিবার কল্যাণ সহকারী হিসেবে চাকুরি পান তিনি। ৬ মে ১৯৭৪ সালে তাঁর বিয়ে হয় একই গ্রামের তহসেন আলীর সাথে। তহসেন আলী পেশায় স্কুল শিক্ষক। কিন্তু তাঁর কপালে সুখ বেশিদিন সইল না। সতিনের সংসারে থাকতে না পেরে তিনি চলে আসেন ভাইয়ের সংসারে। বর্তমানে এক ছেলে ও এক মেয়ের জননী সামসুন্নাহার। ছেলেমেয়েদের নিয়ে তাঁর অনেক স্বপ্ন। যুদ্ধপরাধীদের বিচার হবে। দেশ সন্ত্রাস ও দারিদ্র্যমুক্ত হবে।

আনোয়ারা বেগম অঞ্জলি
(শাহরাস্তি, চাঁদপুর)

একাত্তরের অঞ্জলি হালসা-ই বর্তমানে আনোয়ারা বেগম অঞ্জলি। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাহসী যোদ্ধা। তাঁর কথা জানতে পারি মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল থেকে। অনেক খোঁজাখুঁজির পরে চাঁদপুর জেলার শাহরাস্তি থানার দেবকরা গামে সাক্ষাৎ হয় তাঁর সঙ্গে। কথা হয় অঞ্জলির সাথে। অত্যন্ত মিষ্টভাষী তিনি।

অঞ্জলির পৈতৃক নিবাস চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুরহুদা থানার দক্ষিণ আবাসডাঙ্গা ইউনিয়নের দক্ষিণ কার্পাসডাঙ্গা গ্রামে। তাঁর বাবার নাম সুধীর মণ্ডল এবং মা পান্না মণ্ডল। অঞ্জলি হালসা'রা তিন ভাই ও সাত বোন। সবার ছোট তিনি। মাত্র চার বৎসর বয়সে তাঁর বাবা মারা যান। অতি দারিদ্র্যের মধ্যে দশম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেন পরিবারের এই সর্বকনিষ্ঠ মেয়েটি। ১৯৬৪ সালে মাত্র তের বৎসর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে দিন যাচ্ছিল অঞ্জলির। কিন্তু সুখের অবসান ঘটিয়ে ১৯৬৯ সালে তাঁর স্বামী ইহলোক ত্যাগ করেন। স্বামীর রেখে যাওয়া এমন কোনো সম্পদ ছিল না যা দিয়ে সংসার চালাবেন বিধবা অঞ্জলি। দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত তিনি। সীমাহীন দারিদ্র্যের কারণে ১৯৬৯ সালে মেহেরপুর জেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের ভবেরপাড়া (বর্তমানে মুজিবনগর) মিশনারি স্কুলে ও হাসপাতালে চাকুরি নেন তিনি। একই সাথে ছেলেমেয়েদের ওই মিশনারি স্কুলে ভর্তি করেন। এভাবে প্রায় দেড় বছর কেটে যায় অঞ্জলির। দিনপঞ্জিতে আসে একাত্তর।

সতের এপ্রিল একাত্তরে সেই ভয়াল দিনগুলোর মধ্যে বৈদ্যনাথতলায় স্বাধীন বাংলা সরকার গঠিত হয়, যা মুজিবনগর সরকার নামে পরিচিত। সতের এপ্রিলের স্বাধীনতার চেতনায় উজ্জীবিত সেই অভূতপূর্ব অনুষ্ঠান দেখে অভিভূত হন অঞ্জলি। এসময় বিভিন্ন প্রথিতযশা রাজনীতিবিদদের সাথে পরিচয় হয় অঞ্জলির। তাঁর মনে তাগিদ অনুভূত হয়, তিনিও মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে কাজ করবেন।

একাত্তরে দিনগুলো যতই গড়াচ্ছিল, আহত যোদ্ধাদের সংখ্যা ততই বাড়তে লাগল। পরম মাতৃস্নেহে আহতদের সেবা করে যাচ্ছিলেন তিনি। মিশনারিতে

চিকিৎসাকালে তাঁর সাথে পরিচয় ঘটে ৮নং সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার মেজর এম.এ. মঞ্জু এবং এ.আর. আজম চৌধুরী ও ওবায়েদ উল্লাহ্'র সাথে। তাদের প্রেরণায় অঞ্জলি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

অঞ্জলি আগ্নেয়াস্ত্রের প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন ভারতের হৃদয়পুর ক্যাম্প থেকে। হৃদয়পুর ক্যাম্প ছিল বৈদ্যনাথতলার কাছাকাছি। নার্স হিসেবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি রাইফেল চালনা ও গ্রেনেড নিক্ষেপ করাতে তিনি যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন। পাক সেনাদের আকস্মিক আক্রমণ মোকাবেলা করার জন্য তাঁকে এই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল।

এসময়ে প্রায়ই মুক্তিযোদ্ধারা তাঁদের মিশনারিতে আসত এবং মাঝেমধ্যে থাকত। এদিকে পাক মিলিটারি মুক্তিযোদ্ধা মতিনকে ধরার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করে। মে মাসের মাঝামাঝিতে মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মতিন পাটোয়ারী পাকসেনাদের তাড়া খেয়ে আসে তাঁদের মিশনারিতে। সারাদিন সে কিছুই খায় নি। ক্ষুধার্ত মুক্তিযোদ্ধাকে মিশনারির ছেলেমেয়েরা একটা জাম্বুরা খেতে দেয়। ছেলেমেয়েদের দেয়া জাম্বুরা খেতে খেতে মনে পড়ে তাঁর নিজের ছেলেমেয়েদের কথা। কেঁদে ফেলেন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার সুবেদার আব্দুল মতিন। মিশনারির বাচ্চারা কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলে মতিন তাঁর ছোট ছোট বাচ্চাদের কথা বলেন। অঞ্জলি ও মিশনারির বাচ্চারা সান্ত্বনা দেয় মুক্তিযোদ্ধা মতিনকে। পরের দিন এতিমখানার ছেলেমেয়েরা দেখতে পায়, দুইজন রাজাকার মুক্তিযোদ্ধা মতিনকে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে পাক সেনাদের ক্যাম্পে। বাচ্চারা ছুটে আসে অঞ্জলির কাছে। বাচ্চারা অঞ্জলির কাছে আকুতি-মিনতি জানায় মতিনকে বাঁচানোর জন্য। মুহূর্তে হতভম্ব হয়ে পড়েন অঞ্জলি। কিংকর্তব্যবিমূঢ় অঞ্জলি মুহূর্তে দিশাহারা। মতিনের পিছু ছুটতে থাকেন অঞ্জলি। অঞ্জলির কোনো অনুনয়-বিনয়ে গলে না পাষাণ রাজাকারের মন। পুরস্কারের লোভে উন্মত্তের মতো ছুটতে থাকে তারা। মুক্তিযোদ্ধা মতিনের কোমরে দড়ি বেঁধে অমানবিকভাবে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছিল রাজাকাররা। সামনে দুই রাজাকার মাঝখানে মুক্তিযোদ্ধা মতিন এবং পেছনে অঞ্জলি। এরই মধ্যে অঞ্জলি মুক্তিযোদ্ধা মতিনের ঘাড়ের স্টেনগানটি কৌশলে ধানক্ষেতে লুকিয়ে ফেলে।

মতিন পাটোয়ারীকে পাকসেনাদের ক্যাম্পে নিয়ে যায় জালিম দুই রাজাকার। পাকবাহিনীর পায়ে ধরে কান্নাকাটি করে অঞ্জলি। তিনি কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, 'ও মতিন পাটোয়ারী নয়, ও আমার স্বামী। ওরা ঝুট বলতা হায়। ওরা পুরস্কারের লোভে আমার স্বামীকে ধরে এনেছে। আমার স্বামীকে ছেড়ে দিন। না হলে আমার তিনটি বাচ্চা না খেয়ে মারা যাবে।' সারাদিন রাজাকাররা যতই বলে 'এ মতিন পাটোয়ারী' ততই অঞ্জলি বলে 'ও মতিন নয়, ও তাঁর স্বামী।' মতিনের দেহ তল্লাশি করে কোনো অস্ত্র পায় না পাকসেনারা। অবশেষে সন্ধ্যায় ছেড়ে দেয় মুক্তিযোদ্ধা মতিনকে।

এদিকে কমান্ডারকে হারিয়ে হৃদয়পুর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে শোকের ছায়া নামে। এতক্ষণে হয়তো মতিনকে মেরে ফেলেছে পাক বাহিনী! এসময় অঞ্জলির সাথে মতিনকে ফিরে আসতে দেখে মুক্তিযোদ্ধারা মতিনকে জড়িয়ে ধরে। আনন্দে কেঁদে ফেলেন কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা।

পরদিন অঞ্জলি মিশনারিতে ফিরে আসেন। মিশনারির কর্তৃপক্ষ এ ঘটনা ভালোভাবে নেয় নি। তারা অঞ্জলিকে ভিন্ন চোখে দেখতে শুরু করে। কাউকে তোয়াক্কা না করে অঞ্জলি দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য জোরেসোরে কাজ শুরু করেন মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে।

বাগুয়ান, বল্লভপুর, রামনগর, হৃদয়পুর, মুজিবনগর, দরিয়াপুর ক্যাম্পে থেকে আহত যোদ্ধাদের সেবা-শুশ্রূষা করেন। কখনো কখনো তিনি ৮নং সেক্টরের অধীন বিভিন্ন রণক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে সম্মুখসমরে গিয়েছেন। অস্ত্র-গোলাবারুদ পৌঁছে দিয়েছেন রণক্ষেত্রে। তিনি যে সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্রে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছেন তার মধ্যে বাগোয়ান, দারিয়াপুর ও বৈদ্যনাথতলার যুদ্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাগোয়ান যুদ্ধ হয় বর্ষা মৌসুমে। পাকবাহিনী বল্লভপুর হাসপাতালের দিকে যাচ্ছিল। অঞ্জলি মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে আখের ক্ষেতে ওঁত পেতে থাকে। পাকবাহিনী বন্দুকের রেঞ্জের মধ্যে আসতেই আক্রমণ চালান তিনি। এ যুদ্ধে চারজন পাকসেনা মারা যায় এবং পাকসেনাদের একটি গাড়িসহ বেশ কিছু গোলাবারুদ দখল করে নেয় অঞ্জলিরা।

দরিয়াপুরে পাকবাহিনীর ক্যাম্প ছিল। অঞ্জলি ছদ্মবেশ ধারণ করে চারজন মুক্তিবাহিনীর সাথে পাকবাহিনীর ক্যাম্পে গ্রেনেড নিক্ষেপ করে আক্রমণ চালায়। প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয় পাকসেনাদের।

পাকবাহিনী বৈদ্যনাথতলায় আসে আগস্ট মাসে। এসময় অঞ্জলিসহ ত্রিশজনের একটি চৌকস দল পাকবাহিনীর উপর অতর্কিত হামলা চালায়। প্রায় ৬০-৭০ জন পাকসেনা ওই যুদ্ধে মারা যায়। অঞ্জলি এ যুদ্ধে স্টেনগান চালিয়েছিলেন।

স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে কাজ করেন মুক্তিযোদ্ধা অঞ্জলি। প্রশংসিত হন তিনি নানাভাবে। দেশ স্বাধীনের পরে ১৯৭২ সালে মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মতিনের সাথে বিয়ে হয় অঞ্জলির। বিয়ের পরে তার নাম হয় আনোয়ারা বেগম অঞ্জলি। আব্দুল মতিনের ঘরে তাঁর একটি মাত্র ছেলে, নাম বিদ্যুৎ। অঞ্জলির স্বামী বীর মুক্তিযোদ্ধা সুবেদার আব্দুল মতিন (অব.) ২৬ এপ্রিল ২০০২ সালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শত দুঃখ-কষ্টের পরে মোটামুটি সচ্ছলভাবে বেঁচে আছেন অঞ্জলি।

আম্বিয়া খাতুন
(যশোর)

বাঙালি জাতির শত সংগ্রামের সফল সংগ্রাম একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ। ত্রিশ লক্ষ বাঙালি শহীদ এবং আড়াই লক্ষ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের মহান স্বাধীনতা। জননীসম জন্মভূমিকে পাকদখলদার বাহিনীর কবল থেকে বাঁচানোর সংকল্পে নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে একাত্তরে আম্বিয়া খাতুন ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন শত্রুর মোকাবেলা করতে। পারিবারিক ও সামাজিক কোনো বিষয়ের প্রতি তোয়াক্কা না করে বীরত্বের সাথে লড়েছেন তিনি। জননীর স্নেহে সারিয়ে তুলেছেন আহত যোদ্ধাদের।

যশোর জেলার শার্শা উপজেলা সদরে ১৯৫৭ সালের ৩১ জানুয়ারি নিজ পিত্রালয়ে জন্ম নেন বীর কন্যা আম্বিয়া। ব্যবসায়ী পিতার অতি আদরের প্রথম সন্তান আম্বিয়া অবলীলায় বেড়ে ওঠেন গৃহিণী মায়ের কোলে। চার ভাই-বোনের মধ্যে জ্যেষ্ঠ আম্বিয়া একাত্তরে দশম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত। সভা-সমাবেশ, মিছিল, শিক্ষকদের আলোচনা এবং রাজনীতি সচেতন বাবার সাথে কথোপকথনে পাকশাসকদের শোষণ এবং স্বাধিকার বিষয়ে সচেতনতা অর্জন করেন তিনি।

১০ এপ্রিল '৭১ পাকসেনাদের শেলের আঘাতে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় তাঁর ছবির মতো সাজানো গ্রামখানি। পাকসেনাদের নির্যাতনের তীব্রতা দিনে দিনে এতই বাড়তে থাকে যে, জননী জন্মভূমিকে বাঁচানো অনিবার্য হয়ে পড়ে। শরণার্থীবেশে পরিবারের সাথে চলে যান ভারতে। ভারতের বনগাঁ শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় জোটে তাঁদের। মুক্তিপাগল সন্তানেরা কতক্ষণ বসে থাকতে পারে ঘরের কোণে? জননীসম জন্মভূমি তাঁদের যে হাতছানি দিয়ে ডাকছে বারবার। আম্বিয়াসহ পাঁচজন মেয়ে আওয়ামী লীগের বনগাঁ অফিসে যায় মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য। মায়ের বারণ, দাদিমার নিষেধ, সামাজিক বাধা— কোনো কিছুই টলাতে পারে নি অবিচল, অকুতোভয় আম্বিয়াকে। বনগাঁ অফিসের অফিস সহকারী আশ্রাব আলীর সহযোগিতায়, পার্লামেন্ট সদস্য তৈয়াবুর রহমানের নিকট থেকে চিঠি নিয়ে আম্বিয়া যান গোবরা ক্যাম্পে। এ

সময় তাঁর সতীর্থ ছিলেন নাজমা খাতুন, মাজেদা বেগম, (বর্তমানে বেনাপোল থাকেন) ফাতেমা বেগম এবং কানিজ।

গোবরা ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে যোগদান করেন আম্বিয়া। রাইফেল ও গ্রেনেড চালানো বিষয়ে একটি প্রশিক্ষণ দেয়া হয় তাঁকে। বিশ দিন মেয়াদি এ প্রশিক্ষণ অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে শেষ করেন তিনি। তাঁকে প্রশিক্ষণ দেন নজরুল ইসলাম। নজরুল ইসলাম ছিলেন একজন সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত অফিসার। সশস্ত্রযোদ্ধা হিসেবে আগ্নেয়াস্ত্রের প্রশিক্ষণ পেয়ে নিজেকে তৈরি করেন সশস্ত্রযোদ্ধা হিসেবে।

এ সময় আহত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা এতই বাড়তে থাকে যে, রোগী সামলানো ছিল কষ্টকর। কমান্ডার এবং কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সশস্ত্র নারী যোদ্ধাদের নার্স হিসেবে পাঠিয়ে দেয়া হয় বিভিন্ন অস্থায়ী হাসপাতালগুলোতে। একই সিদ্ধান্তের আদলে গোবরা থেকে আম্বিয়াসহ পনেরজনের একটা ব্যাচকে পাঠিয়ে দেয়া হয় আগরতলা অস্থায়ী হাসপাতালে। আগরতলা অস্থায়ী হাসপাতালে আম্বিয়া, ডাক্তার সেতারা বেগমের তত্ত্বাবধানে কাজে যোগ দেন।

আগরতলায় প্রশিক্ষণ নেন নার্সিং বিষয়ে। পনের দিনের প্রশিক্ষণেই আম্বিয়া দক্ষ নার্সদের মতো কাজ করতে পারতেন। নিরলস পরিশ্রম ও একাগ্রতা আম্বিয়াকে প্রশিক্ষণে সফলতা এনে দেয়। নার্সিং প্রশিক্ষণ শেষে আগরতলা ক্যাম্প হাসপাতালে নার্সিং-এর কাজ করতে থাকেন মুক্তিযোদ্ধা ডা. সেতারা বেগমের তত্ত্বাবধানে। পরম মমতায় আম্বিয়া সারিয়ে তুলেছেন আহত যোদ্ধাদের। তাঁর সেবাতে আহত যোদ্ধারা দ্রুত সেরে উঠে আবার গেছেন রণক্ষেত্রে, ছেদ করেছেন শত্রুমস্তক। নিরলস পরিশ্রমী আম্বিয়া একাত্তরের শেষদিন পর্যন্ত কাটিয়েছেন আহত যোদ্ধাদের শিয়রে, আগরতলা অস্থায়ী হাসপাতালে।

একাত্তরের পঞ্চদশী আম্বিয়া ১৯৭৩ সালে এসএসসি পাশ করে ১৮ ডিসেম্বর ১৯৭৬ সালে এসএম সফিকে বিয়ে করে সংসারী হন। স্বামীর অনুপ্রেরণায় ১৯৮৪ সালে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন তিনি। বর্তমানে আম্বিয়া তিন মেয়ের জননী। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের সৈনিক আম্বিয়া বর্তমানে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পরিচালক। সমাজে পিছিয়ে পড়া মানুষের ভাগ্যন্নোয়নের জন্য অবিশ্রান্তভাবে কাজ করছেন তিনি।

বর্তমান নৈরাজ্য এবং বিশৃংখলতায় হতাশ আম্বিয়া। তিনি ক্রোধকণ্ঠে বলেন, 'এমন দেশের জন্য তো যুদ্ধ করি নি। যেখানে বাবার কোলে শিশু নিরাপদ নয়, এমন দেশের জন্য তো যুদ্ধ করি নি যে দেশে রাজাকাররা পুনর্বাসিত হবে। এমন দেশ আমরা চাই নি যে দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি থাকবে না। আমরা যুদ্ধ করেছিলাম দারিদ্র্য, সন্ত্রাস ও রাজাকারমুক্ত একটা অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ দেশের জন্য। কিন্তু পেয়েছি ...?

তিনি সিক্ত কণ্ঠে বলেন, 'দেশ স্বাধীনের পরে, মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য অনেক গঞ্জনা সহ্য করেছি। পারিবারিকভাবে শুনেছি আজেবাজে কথা, তোয়াক্কা করি নি। আজ রাজাকারদের আস্ফালন দেখে আমি শঙ্কিত; পাছে মুক্তিযুদ্ধের সকল অর্জন শেষ না হয়।'

জাহানারা বেগম আলো
(ঢাকা)

৯নং সেক্টরের সাব-কমান্ডার মেজর জিয়াউদ্দিনের কাছ থেকে মুক্তিযোদ্ধা জাহানারা বেগমের কথা জানতে পাই। তাঁর সাথে দেখা হয় ইত্তেফাক অফিসে। এই অফিসের সবাই তাঁকে চেনে কর্মচারী ইউনিয়নের একজন নেতা হিসেবে। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তাঁর অবদানের কথা হাতেগোনা কয়েজন সহকর্মী ব্যতীত তেমন কেউ জানে না; অন্যেরা তাঁকে জানে একজন সৎ ও দরদি মানুষ হিসেবে।

জাহানারা বেগমের জন্ম ২০ মার্চ ১৯৫১ সালে পিরোজপুর জেলার রাজারহাট গ্রামে। তাঁর বাবা নূর মোহাম্মদ দেওয়ান এবং মা রাবেয়া বেগম। চার ভাই-বোনের মধ্যে তিনি চতুর্থ। একাত্তরের মার্চ মাসে তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এম.কম প্রথম বর্ষের ছাত্রী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে থাকতেন তিনি। মার্চ মাসে ঢাকা শহর ছিল থমথমে ভাব। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে চলছিল ক্লাস বর্জন। ১০ মার্চ তিনি পিরোজপুরে তাঁর গ্রামের বাড়িতে চলে আসেন।

২৫ মার্চ ঢাকায় গণহত্যা শুরুর পরে মফস্বল শহরগুলোতে পাকসেনাদের প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়। কার্যত এই প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। ২৮ মার্চ পাকবাহিনীর অত্যাচার থেকে পিরোজপুর এলাকা রক্ষার জন্য ছেলেদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছিল। একই সময় পিরোজপুর শহর ও পাশের গ্রামগুলো থেকে ছেলেদের পাশাপাশি শিক্ষিত মেয়েদের মুক্তিযুদ্ধে প্রস্তুতির জন্য বাছাই করা হচ্ছিল। এই বাছাই প্রক্রিয়া এবং প্রশিক্ষণগুলোর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মেজর জিয়াউদ্দিন, তৎকালিন ছাত্রনেতা এম.এ মান্নান, আলী হায়দার খানসহ আরো কয়েকজন। প্রথম ব্যাচে বাছাইকৃত ২০জন মেয়ের সঙ্গে জাহানারা বেগম আলো ও তাঁর বোন লিলি অন্তর্ভুক্ত হন। ২৯ মার্চ তাঁদের প্রশিক্ষণ শুরু হয়।

তাঁদের প্রশিক্ষণ হয় পিরোজপুর ওয়াপদা কলোনি মাঠে। প্রশিক্ষণের মধ্যে ছিল পিটি, প্যারেড, বিভিন্ন ধরনের বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহার এবং থ্রি নট থ্রি রাইফেল চালানো। তাদের প্রশিক্ষণ দেন ফজলুর রহমান। ফজলুর রহমান ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত

সেনা সদস্য। আগ্নেয়াস্ত্রের পাশাপাশি তাঁদেরকে নার্সিং প্রশিক্ষণও দেয়া হয়। নার্সিং প্রশিক্ষণ দেন ডা. শ্যামাচরণ শাহা ও ডা. মমতাজ। নার্সিং ও সশস্ত্র প্রশিক্ষণের মেয়াদ ছিল একমাস। এপ্রিল মাসের পুরো সময়টা ধরে চলছিল প্রশিক্ষণ ও মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি।

মে মাসের প্রথম দিকে পিরোজপুরে পাকসেনারা স্থায়ীভাবে ঘাঁটি স্থাপন করে। মুক্তিযোদ্ধারা পাকসেনাদের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ সৃষ্টি করেছিল, পাকবাহিনীর ভারী অস্ত্রশস্ত্রের নিকট তা কর্পুরের মতো হাওয়ায় মিলে যায়। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে মুক্তিযোদ্ধারা। এ সময় জাহানারা বেগম পিরোজপুর শহর থেকে সাত কিলোমিটার দূরে নামাজপুর নামক গ্রামে পরিচিতের বাড়িতে আশ্রয় নেন। আশ্রয়দাতার মেয়ে হোসনে আরা বেগম অঞ্জু ছিলেন জাহানারা বেগমের সহযোদ্ধা। যুদ্ধ শুরুর আগে তাঁরা পিরোজপুর শহরের রাজারহাট এলাকায় পাশাপাশি বাসায় থাকতেন। মে মাসের মাঝামাঝি সময় অন্যান্য এলাকার মতো পিরোজপুরের উল্লেখ্যযোগ্য এলাকা ঘিরে ফেলে পাকসেনারা।

নামাজপুর গ্রামে বেশিদিন থাকতে পারেন নি আলো। জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে তিনি তাঁর পরিবারের সাথে ফিরে আসেন পিরোজপুর শহরে। জুলাই মাসে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সন্ধান পান এবং তাঁদের সাথে যোগাযোগ শুরু করেন। একই সময়ে তিনি বিভিন্ন ছদ্মবেশ ধারণ করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসহ দ্রব্যাদি এবং গ্রাম থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য চাল, ডাল, কাপড়, অর্থ সংগ্রহ করেন। গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং এসমস্ত দ্রব্যাদি পুলক ও কামাল নামের দুইজন কিশোর মুক্তিযোদ্ধার মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের সরবরাহ করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে আলোর সক্রিয়ভাবে কাজ করার কথা পাকবাহিনী ও তাঁদের দোসরদের কাছে পৌঁছালে পাকসেনারা আলোকে ধরার জন্য তাঁর বাসায় হানা দেয়। ভাগ্যক্রমে সেদিন আলো বেঁচে যান। আলোকে না পেয়ে পাকবাহিনী তাঁর পরিবারের সদস্যদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। আলোকে ধরার জন্য হন্য হয়ে খুঁজতে থাকে পাকবাহিনী। তিন-চার বার তাঁর বাসায় হানা দেয় পাকসেনারা।

এ অবস্থায় পিরোজপুরে থাকা মোটেও নিরাপদ নয় ভেবে আলো তাঁর ভাইয়ের সাথে তাঁর বাবার এক বন্ধুর বাড়ি চলে যান। তাঁর বাবার বন্ধুর বাড়ি ছিল বরিশাল জেলার হিজলা থানায়। তাঁর বাবার বন্ধু ছিলেন আওয়ামী লীগের ইউনিয়ন পর্যায়ের একজন নেতা। কিছুদিন হিজলায় থাকার পরে নিরাপত্তার অভাবে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে আশ্রয়দাতা তাঁদের পিরোজপুরে পাঠিয়ে দেন।

পিরোজপুরে ফিরে এসে জাহানারা বেগম আলো মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগাযোগ করেন এবং সক্রিয়ভাবে কাজ শুরু করেন। এ সময়ে তিনি যেসব কাজ করতেন তন্মধ্যে বিভিন্ন ছদ্মবেশ ধারণ করে তথ্য সংগ্রহ, খাদ্য সংগ্রহ, আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ সংরক্ষণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে আলোর

সক্রিয় সম্পৃক্ততার সংবাদ পাকবাহিনী জানতে পেরে নভেম্বর মাসে পুনরায় আলোদের বাসায় হানা দেয়। ওইদিন আলো গিয়েছিলেন খাদ্য সংগ্রহের কাজে। ভাগ্যক্রমে সেদিন আলো রক্ষা পেলেও তাঁর ভাই নূরুল হুদাকে পাকসেনারা ধরে নিয়ে যায়। দুইদিন পরে মুক্তি পান তাঁর ভাই নূরুল হুদা।

এরপর পিরোজপুর শহরে থাকা তাঁদের পক্ষে মোটেও নিরাপদ নয় ভেবে শহরের অদূরে রানীপুর গ্রামে আশ্রয় নেন। রানীপুর গিয়েও আলো মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে সক্রিয়ভাবে কাজ করেন। দেশ স্বাধীনের পূর্ব পর্যন্ত আলো সরাসরি মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে কাজ করেন এবং প্রশংসিত হন।

দেশ স্বাধীনের পরে ১৯৭৬ সালে এম.কম পাশ করেন আলো। ১৯৭৯ সালে তিনি দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় কর্মজীবন শুরু করেন। ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৭ সালে তিনি ঢাকায় বাসাবোতে বসবাসরত সৈয়দ হাফিজুর রহমানের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৮১ সালে দৈনিক সংবাদের চাকুরি ছেড়ে দৈনিক ইত্তেফাকে যোগদান করেন। তাঁর দুই মেয়ে। মেয়েদের বিয়ে হয়েছে।

আলো হতাশ হন নৈরাজ্য-দুর্নীতি-সাম্প্রদায়িকতার তাণ্ডব দেখে। তিনি ক্রোধের সাথে বলেন, 'রাজাকাররা এখন ক্ষমতায় আর মুক্তিযোদ্ধারা অর্ধাহারে-অনাহারে, অনাদরে-অবহেলায় রয়েছে। এরকম দেশ দেখতে হবে, তা ভাবি নি।'

মুক্তিযোদ্ধাদের যোগ্য মর্যাদা এবং অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসন আর মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস লেখা ও সংরক্ষণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

মোসাম্মৎ মর্জিনা বেওয়া
(ভোলাহাট)

মর্জিনা বেওয়ার জন্ম সাল তারিখ কিছুই তাঁর মনে নাই। তবে সাতচল্লিশে দেশ বিভাগের সময় তাঁর বয়স দু'আড়াই বছর ছিল বলে তাঁর মায়ের নিকট থেকে শুনেছেন তিনি। মর্জিনার জন্ম ভোলাহাট থানার গোহালবাড়ি ইউনিয়নের রাধানগর গ্রামে। তিন ভাই ও দুই বোনের মধ্যে মর্জিনা চতুর্থ। তাঁর বাবা সাধু মুন্সি পেশায় কৃষিজীবী এবং মা কোঠাবিবি গৃহিণী।

মুক্তিযোদ্ধা মেহেরুন্নাহারের সাথে কথা বলে ফেরার পথে শুনতে পাই মুক্তিযোদ্ধা মর্জিনা বেওয়া-র কথা। এলাকার লোকমুখে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মুক্তিযোদ্ধা মর্জিনা বেওয়ার বাড়িতে হাজির হই বেলা এগারটার দিকে। সময়টা ছিল ৮ নভেম্বর ২০০২। জরাজীর্ণ একটা মাটির ঘরের এক পাশে থাকে কয়েকটি ছাগল, ভেড়া অন্যপাশে থাকেন মুক্তিযোদ্ধা মর্জিনা। ঘরের ভেতর একটা চৌকি আছে। চৌকিটার তিন পায়া কাঠের আর এক পায়া ইটের। সেখানে কথা হয় তাঁর সাথে। খুবই আন্তরিক তিনি। আমাদের সাথে এমনভাবে কথা বললেন, যেন আমরা তার নিকট শত জনমের চেনা।

একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ শুরুর আগেই মর্জিনা বেগম ম্যাট্রিক পাশ করেছেন। 'পাকিস্তানিরা বাঙালিদের শোষণ করছে'— এই কথাগুলো তিনি অনেকের কাছে শুনেছেন। ২৫ মার্চে ঢাকায় গণহত্যা শুরু হওয়ার পর থেকে তিনি নানা সূত্রে পাকসেনাদের অত্যাচারের কথা জানতে পারেন। ভোলাহাটে পাকসেনারা স্থায়ীভাবে ঘাঁটি স্থাপন করতে পারে নি। কারণ ভোলাহাটের তিন দিক ভারত এবং পূর্বদিকে মহানন্দা ও তার একটা শাখানদী দ্বারা বেষ্টিত। তাছাড়া একাত্তরে ভোলাহাটের যোগাযোগ ব্যবস্থাও তেমন ভালো ছিল না। পাকবাহিনী ভোলাহাটের পূর্বপাশের থানা গোমস্তাপুরে স্থায়ীভাবে ঘাঁটি স্থাপন করে। সেখান থেকে পাকসেনারা মাঝেমধ্যেই আক্রমণ চালাত ভোলাহাটের বিভিন্ন গ্রামে। পাকবাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসরদের তাণ্ডবলীলায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে কুলবধূ মর্জিনা। সে তাঁর স্বামীর নিকট প্রস্তাব

রাখে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য। ছোট বাচ্চার কথা বিবেচনা করে তাঁর স্বামী প্রথমে মুক্তিযুদ্ধে যেতে সম্মতি দেন নি। দেশের ভয়াবহতা লক্ষ করে তাঁর স্বামীকে শেষপর্যন্ত রাজি করান মর্জিনা। স্বামীর সম্মতি নিয়ে তিনি ৭ নং সেক্টর এলাকার ৩নং সাব সেক্টরের অধীনে গ্রুপ কমান্ডার হাফিজউদ্দিন হাসনুর নিকট যান। বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। হাফিজউদ্দিন মর্জিনাকে নার্স হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিতে বলেন। কমান্ডার হাফিজউদ্দিনের অনুমতি নিয়ে নভেম্বর মাসে মর্জিনা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন।

মর্জিনার প্রশিক্ষণ হয় বাংলাদেশের গিলাবাড়ি ও ভারতের মালদহ জেলার আদমপুর ক্যাম্পে। সেবিকা হিসেবে তিনি ২১ দিনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। মূলত তাঁদের এই নার্সিং প্রশিক্ষণ হয় হাতে-কলমে। ডাক্তার জসি ও ডাক্তার বিপেন তাঁদের নার্সিং প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষক ছিলেন। নার্সিং প্রশিক্ষণের পাশাপাশি আগ্নেয়াস্ত্রেরও প্রশিক্ষণ দেয়া হয় তাঁকে। আগ্নেয়াস্ত্রের মধ্যে গ্রেনেড ছোড়া ও বিভিন্ন ধরনের বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহার ছিল অন্যতম। নিজামউদ্দিন নেজা, হাফিজউদ্দিন হাসনু তাঁদের আগ্নেয়াস্ত্রের প্রশিক্ষণ দেন।

আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সুস্থতার প্রয়োজনে সব ধরনের কাজ করতেন তিনি। কাজে তাঁর কোনো দ্বিধা ছিল না। এ ছাড়া ছোট ছোট অপারেশনের সময়ও তিনি ডাক্তারদের সহযোগিতা করতেন। আহতদের অবস্থা খারাপ হলে ডাক্তারদের তত্ত্বাবধানে জরুরিভিত্তিতে সাগরদিঘি এবং মালদহ সরকারি হাসপাতালে পাঠানো হতো। দেশ স্বাধীনের পূর্ব পর্যন্ত তিনি তাঁর দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে পালন করেন।

মর্জিনা বেওয়া কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, 'ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্ত এবং আড়াই লক্ষ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের স্বাধীনতা। কিন্তু যাদের রক্ত আর ইজ্জতের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেলাম তাদের ত্যাগ এবং ইচ্ছা কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে? সেই রাজাকারেরা পুনর্বাসিত হয়েছে। তারা জোট সরকারের শরিক। তাদের গাড়িতে আজ জাতীয় পতাকা। কিন্তু যে-সমস্ত মায়েরা সন্তান হারাল, তারা কী পেল?'

স্বাধীনতার পরে নারী মুক্তিযোদ্ধাদের কাজের যথাযথ মূল্যায়ন হয় নি বলে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। স্বাধীন দেশে মানুষের কাছে তাঁর প্রত্যাশা ছিল অনেক বেশি। ভেবেছিলেন, যে-দেশের মানুষেরা জীবন দিয়ে স্বাধীনতা লাভ করে তাদের মানসিকতারও পরিবর্তন হয়। কিন্তু তিনি নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায় দেখলেন নারীদের কাজের বিচার করার ক্ষেত্রে পুরুষদের মানসিকতা বদলায় নি। এজন্য তিনি ক্ষুব্ধ। তিনি সমাজের পুরুষ মানুষদের আরো উদার মানুষ হিসাবে দেখতে চান।

মর্জিনার তিন ছেলে চার মেয়ে। সকল ছেলেমেয়েদের বিয়ে হয়েছে। তারা পৃথক। মর্জিনার ছেলেরা দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত। তারা নিজেদের খাবারই

জোগাড় করতে পারছে না। একা মর্জিনা এখন সম্পূর্ণ পরমুখাপেক্ষী। যে যা দেয় তা দিয়ে কোনোমতে বেঁচে আছেন তিনি।

বার্ধক্য এবং দারিদ্র্যের ভারে নুয়ে পড়েছেন মর্জিনা। কিন্তু মনের জোরের ঘাটতি নেই তাঁর। এদেশে ঘাতক রাজাকার ও যুদ্ধপরাধীদের বিচার হবে, দেশের মানুষ দারিদ্র্যমুক্ত হবে— এই প্রত্যাশায় আজও বেঁচে আছেন বৃদ্ধা মর্জিনা।

হাফিজা বেগম রিক্তা
(ঢাকা)

বারপাখিয়া। টাঙ্গাইলের দেলদুয়ার থানার একটি নিভৃত গ্রাম। পাখি ডাকা, ছায়া ঘেরা শান্ত এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন হাফিজা বেগম। বাবা মৃত নুরুল হক তালুকদার এবং মা হামিদা বেগম, রিক্তা নামেই ডাকতেন হাফিজাকে। বারপাখিয়ার শ্যামল সবুজ শান্ত প্রকৃতির মতোই নির্মল ছিলেন রিক্তা। এদেশের শ্যামল প্রকৃতি যেমন বৈশাখে রুদ্র হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনি বৈশাখের কালবোশেখীর মতো সময়ে সময়ে ফুঁসে উঠতে পারে এদেশের নারীরা। প্রকৃতিই তাকে শিখিয়ে দেয় সময়ের মন্ত্র। এই মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়েই ২৫ মার্চ '৭১ পাকবাহিনীর নির্মম গণহত্যার প্রতিশোধ নিয়ে দেশকে শত্রুমুক্ত করার দীপ্ত প্রত্যয়ে হাতে অস্ত্র তুলে নেন রিক্তা। শুধু একা নন। পরিবারের ৬জন সদস্য মুক্তিযুদ্ধের গর্বিত অংশীদার।

কাদেরিয়া বাহিনীর সদস্য হিসেবে রিক্তা বেগম চামারী ফতেহপুর ক্যাম্পের অধীনে ইনফর্মার হিসেবে কাজ শুরু করেন। ক্যাম্প কমান্ডার ছিলেন ফজলুর রহমান। রিক্তার কাজের প্রতি তাঁর ছিল অগাধ বিশ্বাস। কমান্ডারের আস্থা আর নিজের কর্মস্পৃহা তাঁর দায়িত্বের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছিল বহুগুণে। মৃত্যুকে তুচ্ছ করে তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং নানান সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য ঢাকায় আসতেন। সংগ্রহ করতেন ওয়্যারলেস, ক্যাসেট প্লেয়ার, দুরবিন, ঔষধপত্র ইত্যাদি। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের ঊর্ধ্বতন সহকারী আরমান আলী ভূঁইয়া তাঁকে সরবরাহ করতেন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি। সেইসাথে বিভিন্ন সরঞ্জাম। তথ্য পৌঁছে দিতেন ক্যাম্পে। ফেরিওয়ালার ছদ্মবেশে তথ্য আদান-প্রদানের কাজ করেছেন বেশিরভাগ সময়। প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি পৌঁছে দিয়েছেন বিস্ময়কর কৌশলে। রাতভর পাহারা দিয়ে মুক্তিবাহিনীর বিভিন্ন অস্ত্র সুকৌশলে সংরক্ষণ করার দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। কতবার ধরা পড়তে গিয়েও নিজের বুদ্ধির জোরে বেঁচে গেছেন তার ইয়ত্তা নেই।

কৌশলগত কাজগুলো যেমন করেছেন ঠিক তেমনি নিরলস সেবা করেছেন আহত মুক্তিযোদ্ধাদের। অন্যান্য নারীদের সংগঠিত করে গড়ে তুলেছেন একটি পূর্ণাঙ্গ

নার্সিং টিম। আহত যোদ্ধাদের প্রাথমিক চিকিৎসা থেকে শুরু করে প্রয়োজনে হাসপাতালে স্থানান্তরের মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলোর নেতৃত্ব দিয়েছেন রিক্তা। কমান্ডার ফজলুর রহমানের কাছ থেকে পিস্তল ও রাইফেল চালনা এবং গ্রেনেড চার্জের প্রশিক্ষণ পান তিনি। সেবিকার হাতে উঠে আসে অস্ত্র। সেই অস্ত্রে রায়খোলা ব্রিজের কাছে পাকসেনাদের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হন সমরে। পাকসেনারা হিংসার আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয় রিক্তাদের ঘরবাড়ি।

কেন যুদ্ধে গিয়েছিলেন প্রশ্ন করা হলে রিক্তা সংক্ষিপ্ত জবাব দেন— শোষণহীন, সুন্দর বাংলাদেশের জন্য।

রিক্তা বিচলিত হন নৈরাজ্য-হিংসা-দুর্নীতি আর পুনর্বাসিত রাজাকারদের দেখে। প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের কথায় আর আগ্রহ দেখায় না বলে হতাশ হয়ে পড়েন রিক্তা। আমাদের সংস্কৃতি হচ্ছে মৌলবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের হাতে। আমরা অধঃপতিত হচ্ছি; মূল্যবোধ হারাচ্ছি; হারাচ্ছি আমাদের সুবর্ণ চেতনা মুক্তি সংগ্রামের। এই ধারণারই অনুরণন পাওয়া গেল তাঁর উচ্চারণে।

প্রজন্ম কি শুধুই ঝিমিয়ে পড়বে, নাকি উঠে দাঁড়াবে? কথা বলতে বলতে চোখের কোণ ভিজে আসে '৭১-এর অদম্য সাহসিনী রিক্তার। তাঁর আর্দ্র চোখই বলে দেয় প্রজন্মের কর্তব্য।

পুষ্পরানী হালদার
(কোটালিপাড়া)

কেন্দ্রীয় মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, ঢাকা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক মুক্তিবার্তার একটি তালিকা থেকে জানতে পাই মুক্তিযোদ্ধা পুষ্পরানী হালদারের কথা। ১৪ অক্টোবর ২০০৩ সালে পুষ্পরানী হালদারের উদ্দেশে রওনা হই কোটালিপাড়া। কোটালিপাড়া গোপালগঞ্জ জেলার একটি থানা। শরতের বিকেলে কোটালিপাড়ার মনোমুগ্ধকর বিলের দৃশ্য অপরূপ দেখাচ্ছিল। বিলের পানি টান ধরেছে। বিলের ভেতরে শাপলা ফুলের অপূর্ব সমারোহ, যেন আকাশের শত কোটি তারা। সারাদিনের ক্লান্ত শেষে পাখিরা ফিরছে তাদের বাসায়। বিলের মধ্যে দিঘা ধান একে অপরের সাথে কাঁধ মিলিয়ে রয়েছে পারস্পরিক নিবিড় বন্ধনে। এমনই মনোমুগ্ধকর সোনার বাংলাকে শ্মশানে পরিণত করতে চেয়েছিল দখলদার পাকসেনারা। রাতে থাকলাম কোটালিপাড়া থানা সদরে। সকালে মুক্তিযোদ্ধা মুজিবুর রহমানের সহযোগিতায় পৌঁছালাম পুষ্পরানী হালদারের বাড়ি। সাজানো-গোছানো ছোট একটা সংসার পুষ্পর। খোলামেলা মানুষ তিনি। আমাদের সাথে কথা বললেন অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে।

পুষ্পরানী হালদারের জন্ম ১৯৫৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আগৈলঝড়া থানার পয়সারহাট গ্রামে। তাঁর বাবা শীতলচন্দ্র হালদার এবং মা ফুলমালা হালদার। পুষ্পরানী, দু'বোনের মধ্যে ছোট।

একাত্তরে ছিলেন পুষ্প নবম শ্রেণীর ছাত্রী। পাকবাহিনী মে মাসের মাঝামাঝি বাংলার অন্যান্য এলাকার মতো কোটালিপাড়ার বিভিন্ন এলাকায় আক্রমণ শুরু করে। পাকবাহিনী গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। হত্যা করে নিরীহ গ্রামবাসীকে। নির্যাতন চালায় মা-বোনদের ওপর। এই সুযোগে লুটপাট করে কুলাঙ্গার রাজাকারেরা। রাজাকার ও দখলদার বাহিনীর এরকম তাণ্ডবে ক্ষিপ্ত এবং প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন পুষ্পরাণী। তিনি সুযোগ খুঁজতে থাকেন মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য।

এ সময় পুষ্পরানী জানতে পারেন মুক্তিযোদ্ধা হেমায়েতউদ্দিনের কথা। পুষ্পরাণী তাঁর দাদা জগদীশচন্দ্র হালদারের সাথে প্রথমে আশালতা বৈদ্যের নিকট যান।

আশালতা বৈদ্য তখন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কাজ করছেন। জগদীশচন্দ্র হালদার এবং আশালতার সহযোগিতায় তিনি মে মাসের শেষদিকে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার হেমায়েত উদ্দিনের নিকট যান এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেন। কমান্ডার হেমায়েত উদ্দিন পুষ্পরানীর আগ্রহে খুশি হন এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দেন। কমান্ডারের অনুমতি নিয়ে তিনি মুক্তিযোদ্ধা নার্স হিসেবে যোগ দেন।

মে মাস থেকেই আহত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। বিভিন্ন জায়গায় আহতদের চিকিৎসা হতো। ডা. ব্যানার্জি তাঁর পয়সারহাট চেম্বারে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়মিত চিকিৎসা করতেন। ডা. ব্যানার্জির চিকিৎসা সেবার মান ছিল অত্যন্ত ভালো। একারণে ডাক্তার ব্যানার্জির চেম্বারে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে আসা হতো। আগস্ট মাসে তাঁর চেম্বার এবং থাকার ঘরে অস্থায়ী হাসপাতালের মতো কাজ শুরু করেন। পুষ্পরাণী হালদার জুন মাসের প্রথম দিকে ব্যানার্জির সাথে কাজ শুরু করেন।

নার্স হিসেবে পুষ্প একুশ দিনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। মূলত তাঁর প্রশিক্ষণ হয় হাতে-কলমে। তাঁকে প্রশিক্ষণ দেন ডা. রণজিৎ ব্যানার্জি ও ডা. নিরঞ্জন দাস। পাকবাহিনী পয়সারহাট আক্রমণের পর পুষ্পরাণী ডা. ব্যানার্জীর সাথে বিভিন্ন মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে চলে যান এবং সেখানে আহতদের চিকিৎসা-সেবা দেন। এ সময় পুষ্প আত্মরক্ষার জন্য আগ্নেয়াস্ত্রের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। আগ্নেয়াস্ত্রের মধ্যে ছিল গ্রেনেড ও পিস্তল।

আহতদের ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে ব্যান্ডেজ করা, ইনজেকশন পুশ করা, ঠিকমতো ঔষধ খাওয়ানোর কাজ করতেন পুষ্পরাণী। এ ছাড়া তিনি রেকির কাজও করেছেন। তিনি ঘাগর বাজার ও রামশীলের যুদ্ধে আশালতা বৈদ্যের নির্দেশে অস্ত্র পৌছানোর কাজ করেছেন। তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব তিনি অত্যন্ত নির্ভয়ে পালন করতেন।

মুক্তিযুদ্ধে নারীদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'স্বাধীনতার পরে পুরুষ যোদ্ধারা ঘরে ফিরেছেন বীরযোদ্ধা হিসেবে আর নারী যোদ্ধারা ফিরেছেন ধিক্কার নিয়ে। মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য নারীযোদ্ধাদের গেছে সামাজিকভাবে মান-সম্মান। আর পুরুষযোদ্ধারা পেয়েছে প্রশংসা'।

দেশ স্বাধীনের পর ১৯৭৩ সালে তিনি এসএসসি পাশ করেন। পরে হেমায়েত বাহিনীর প্রধান হেমায়েত উদ্দিনের সহযোতিায় মুক্তিযোদ্ধা রমেশচন্দ্র বিশ্বাসের সাথে তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। বর্তমান তার এক ছেলে ও তিন মেয়ে। ছেলে মেয়েরা লেখাপড়া করছে। তিনি একটি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শে নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের গড়ে তোলার আহ্বান জানান মুক্তিযোদ্ধা পুষ্পরানী হালদার।

মোছাঃ তাসলিমা বেগম
(ভোলাহাট)

মুক্তিযোদ্ধা মেহেরুন্নাহার এবং সাংবাদিক মোঃ সালাউদ্দিনের সহযোগিতায় খুঁজে পাই মুক্তিযোদ্ধা তাসলিমা বেগমকে। ভোলাহাট শহরেই থাকেন তিনি। ৮ নভেম্বর ২০০২ তারিখে কথা হয় তসলিমার সাথে। অত্যন্ত সদালাপী এবং মিষ্টিভাষী মুক্তিযোদ্ধা তাসলিমা।

তাসলিমা খাতুনের জন্ম ৩১ মার্চ ১৯৫২ সালে ভোলাহাট থানার গোপিনাথপুর গ্রামে। তাঁর বাবা আলহাজ মনির উদ্দিন চৌধুরী ব্যবসায়ী এবং মা মোছাঃ খাইরুননেছা গৃহিণী। চার ভাই এবং আট বোন তাঁরা। ভাই-বোনদের মধ্যে তাসলিমা তৃতীয়।

১৯৬৯ সালে তসলিমা বেগম পি.টি.আই পড়তেন। তখন থেকে নিয়মিত বিভিন্ন রাজনৈতিক সভা-সমাবেশে যোগ দিতেন। সভাসমাবেশ, শিক্ষক, সহপাঠীদের সাথে আলাপ-আলোচনা এবং পত্রপত্রিকা পড়ার মাধ্যমে পাকিস্তানের শাসন, শোষণ, বাঙালির স্বাধিকার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা ছিল তাঁর। ছাত্রজীবন থেকে তিনি বিভিন্নভাবে রাজনীতি সচেতন হয়ে ওঠেন। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পূর্বেই তসলিমা পিটিআই পাশ করেন। ২৫ মার্চ কালো রাত্রির পর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাঙলার প্রত্যেকটি জনপদ আক্রমণ করে। নির্বিচারে হত্যা, বাড়িঘর জ্বালানো ও নির্যাতনের হোলি খেলায় মেতে ওঠে পাকবাহিনী ও তাদের দোসর কুলাঙ্গার রাজাকার আলবদরেরা। মে মাসের দিকে তারা ভোলাহাটের পূর্ব পাশের থানা গোমস্তাপুরে স্থায়ীভাবে ঘাঁটি গড়ে তোলে। গোমস্তাপুর থেকে প্রায় মাঝেমধ্যেই আক্রমণ চালায় ভোলাহাট থানার বিভিন্ন গ্রামে। পাকবাহিনী ও তাদের এদেশীয় দালালদের ধ্বংসযজ্ঞে ক্ষিপ্ত এবং প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন তাসলিমা বেগম। পরিবারের সকল বাধা-নিষেধ উপেক্ষা করে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য সুযোগ খুঁজতে থাকেন তিনি।

তাঁদের বাড়ির কাছেই গিলাবাড়ি মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প এবং অস্থায়ী হাসপাতাল। গিলাবাড়ি ক্যাম্প ছিল ৭ নং সেক্টর এলাকায়, ৩ নং সাব সেক্টরের অধীনে। গিলাবাড়ি

ক্যাম্পের ক্যাম্প কমান্ডার ছিলেন হাফিজউদ্দিন হাসনু। আগস্ট মাস থেকে অগণিত আহত মুক্তিযোদ্ধা ভর্তি হয় গিলাবাড়ি হাসপাতালে। তখন ডাক্তার-নার্স ছিল সীমিত। আহত মুক্তিযোদ্ধাদের নার্সিং করার মতো পর্যাপ্ত ডাক্তার-নার্স ছিল না। সে সময় এলাকার একটু শিক্ষিত মেয়েদের খোঁজ করা হচ্ছিল নার্স হিসেবে কাজ করার জন্য।

তাসলিমা, মেহেরুন্নেসা ও সুরাইয়া বেগমের সহায়তায় গিলাবাড়ি ক্যাম্পে কমান্ডার হাফিজউদ্দিন হাসনুর সঙ্গে দেখা করেন এবং মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য তসলিমার আগ্রহ দেখে কমান্ডার হাফিজউদ্দিন হাসনু তসলিমাকে মুক্তিযোদ্ধা-নার্স হিসেবে যোগদান করার অনুমতি দেন। কমান্ডার হাফিজ উদ্দিনের অনুমতি নিয়ে তসলিমা নভেম্বরের প্রথম দিকে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন।

তাসলিমার প্রশিক্ষণ হয় বাংলাদেশের গিলাবাড়ি ও ভারতের মালদহ জেলার আদমপুর ক্যাম্পে। সেবিকা হিসেবে তিনি ২১ দিনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। মূলত তাঁদের এই নার্সিং প্রশিক্ষণ হয় হাতে-কলমে। ডাক্তার জসি ও ডাক্তার বিপেন তাঁদের নার্সিং প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষক ছিলেন। নার্সিং প্রশিক্ষণের পাশাপাশি যে-কোনো অবস্থা মোকাবেলা করার জন্য আগ্নেয়াস্ত্রেরও প্রশিক্ষণ দেয়া হয় তাঁকে। আগ্নেয়াস্ত্রের মধ্যে গ্রেনেড ও বিভিন্ন ধরনের বিস্ফোরক দ্রব্য ছিল অন্যতম। নিজামউদ্দিন নেজা, হাফিজউদ্দিন হাসনু তাঁদের এই আগ্নেয়াস্ত্রের প্রশিক্ষণ দেন।

আহত মুক্তিযোদ্ধাদের যথাযথ পরিচর্যা করা ছিল তাঁর কাজের অন্যতম দিক। আহতের অবস্থা খারাপ হলে ডাক্তারদের তত্ত্বাবধানে জরুরিভিত্তিতে তাঁকে মালদহ এবং সাগরদিঘি সরকারি হাসপাতালে পাঠানো হতো। দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন অবিশ্বাস্য যোগ্যতার সাথে।

একাত্তরে পাকসেনাদের নিষ্ঠুর নির্যাতনের একটি দৃশ্য তিনি দেখেছেন রহনপুর বাংকারে। বাংকারগুলোতে নারীদের যে কী পরিমাণ নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে— তা দেখে তিনি মর্মাহত হন। স্বাধীনতার জন্য নারীরা মূল্য দিয়েছে অনেক, বাংকারগুলো না দেখলে তার এমন অভিজ্ঞতা হতো না। তিনি বলেন, 'রহনপুর বাংকারের সেই ভয়াবহ দৃশ্য যেন আমি আজও চোখ বুজে দেখতে পাই। আমার শরীর শিউরে ওঠে। মন বেদনায় ভরে যায়। ভাবি, হায় নারী স্বাধীনতার জন্য তোমাকে এত মূল্য দিতে হয়!'

তিনি কান্নাজড়িত কণ্ঠে আরো বলেন, 'ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্ত এবং আড়াই লক্ষ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে অর্জিত এই স্বাধীন সোনার বাংলাদেশ। কিন্তু যাদের ইজ্জতের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেলাম তাদের ত্যাগ কতটুকু সফল হয়েছে এবং ইচ্ছার কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে? সেই সমস্ত অত্যাচারী তো আবার পুনর্বাসিত হলো। ক্ষমতা পেল। কিন্তু যে মা-বোনেরা ইজ্জত দিল, তাঁরা কী পেল?'

পুরুষের কাছ থেকে পাওয়া অপমান, গ্লানি আর ধিক্কার নিয়ে বেঁচে আছেন তাঁরা। কথাগুলো কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললেন মুক্তিযোদ্ধা তাসলিমা। তবুও গর্বিত তাসলিমা মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করতে পেরে। একাত্তরের দেশ স্বাধীনের পর ভোলাহাট থানার খরগপুর গ্রামের সাইফুল ইসলামের সাথে বিয়ে হয় তসলিমার। দুই কন্যার জননী তিনি। তাঁর মেয়েরা পড়ালেখা করছে স্কুল-কলেজে। বাংলাদেশকে একটি সুখী সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে দেখতে চান তিনি।

হোসনে আরা বেগম অঞ্জু
(পিরোজপুর)

মুক্তিযোদ্ধা জাহানারা বেগম আলো ও মুক্তিযোদ্ধা রোকেয়া বেগম হেনার কাছ থেকে জানতে পাই মুক্তিযোদ্ধা হোসনে আরা বেগম অঞ্জুর কথা। অঞ্জু থাকেন পিরোজপুর পৌর এলাকার রাজারহাট মহল্লায়। একাত্তরে অঞ্জু আলো ও রোকেয়ার পরিবার এই রাজারহাট এলাকায় থাকতেন। রাজারহাট এলাকার দক্ষিণে কচা ও বলেশ্বর নদীর সংযোগ খাল, খালের উত্তর পাশে তাঁর বাসা। যার পশ্চিমে রয়েছে বলেশ্বর নদী, পূর্বে ঢাকা-পিরোজপুর সড়ক ও উত্তরে কুমারখালী গ্রাম। মুক্তিযোদ্ধা রোকেয়াকে সাথে নিয়ে বিকাল সাড়ে পাঁচটার দিকে যাই মুক্তিযোদ্ধা অঞ্জুর বাসায়। বাসাটি বেশ পরিপাটি। একান্ত আপন পরিবেশে কথা হয় অঞ্জুর সাথে।

হোসনে আরা বেগম অঞ্জু ১৯৬০ সালের ৫ বৈশাখ তদানীন্তন পিরোজপুর মহাকুমার রাজারহাট মহল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা জালাল উদ্দিন আহম্মদ এবং মা হামিদা বেগম। এক ভাই ও তিন বোনের মধ্যে হোসনে আরা বেগম অঞ্জু দ্বিতীয়।

একাত্তরে তিনি নবম শ্রেণীর ছাত্রী ছিলেন। ৭ মার্চ ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর দেয়া ভাষণের পর থেকেই পিরোজপুরের সকল স্তরের জনগণের মধ্যে অভূতপূর্ব জাগরণ শুরু হয়। ১০ মার্চ ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীরা বাঁশের লাঠি ও লোহার বল্লম হাতে নিয়ে মাথায় লালটুপি পরে মুক্তির আন্দোলনে প্রস্তুত হিসেবে মিছিল বের করে। মিছিলে অন্যান্য মেয়েদের সাথে রোকেয়া বেগম হেনা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

মার্চের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি আবেগে আপ্লুত হয়ে বলেন, 'মার্চের প্রতিটি দিনে আমাদের কোনো না কোনো কর্মসূচি ছিল। ২২ মার্চের বিভিন্ন সংগঠনের কর্মীরা ঘরে বসে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা তৈরি করে এবং ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়। ২৩ মার্চ প্রথম পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন তৎকালীন ছাত্রলীগের সভাপতি ওমর ফারুক। একই দিনে সারা পিরোজপুর সদরে সকল দোকানে উত্তোলন করা হয় প্রথম পতাকা।' বাড়িতেও স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন হোসনে আরা বেগম।

২৫ মার্চ রাতে ঢাকায় গণহত্যা শুরু হলে মফস্বল শহরগুলোতে পাকসেনাদের প্রতিরোধ প্রস্তুতি শুরু হয়। কার্যত এই প্রতিরোধের মধ্য দিয়েই মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। ২৮ মার্চ পাকবাহিনীর অত্যাচার থেকে পিরোজপুর এলাকা রক্ষা করার জন্য ছেলেদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছিল। ছেলেদের পাশাপাশি একই সময়ে পিরোজপুর শহর ও পাশের গ্রামগুলো থেকে শিক্ষিত মেয়েদের মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য বাছাই করা হচ্ছিল। এই বাছাই প্রক্রিয়া এবং প্রশিক্ষণে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মেজর জিয়াউদ্দিন, তৎকালীন ছাত্রনেতা এম. এ. মান্নান, আলী হায়দার খানসহ আরো কয়েকজন। প্রথম ব্যাচে বাছাইকৃত ২০জন মেয়ের সঙ্গে জাহানারা বেগম আলো ও তাঁর বোন লিলি অন্তর্ভুক্ত হন। ২৯ মার্চ তাঁদের প্রশিক্ষণ শুরু হয়।

পিরোজপুর ওয়াপদা কলোনির মাঠে (বর্তমান পানি উন্নয়ন বোর্ড) তাঁদের প্রশিক্ষণ হয়। প্রশিক্ষণের মধ্যে ছিল পিটি-প্যারেড, বিভিন্ন ধরনের বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহার এবং থ্রি নট থ্রি রাইফেল চালানো। তাঁদের এই প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক ছিলেন ফজলুর রহমান। ফজলুর রহমান ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত সেনা সদস্য। আগ্নেয়াস্ত্রের পাশাপাশি তাঁদেরকে নার্সিং প্রশিক্ষণও দেয়া হয়। নার্সিং প্রশিক্ষণ দেন ডা. শ্যামাচরন সাহা ও ডা. মমতাজ। নার্সিং ও সশস্ত্র প্রশিক্ষণের মেয়াদ ছিল একমাস। এপ্রিল মাসের পুরো সময়টা ধরে চলেছিল প্রশিক্ষণ ও যুদ্ধের প্রস্তুতি।

মে মাসের প্রথম দিকে পিরোজপুরে পাকসেনারা স্থায়ীভাবে ঘাঁটি স্থাপন করে। প্রথম দিনেই তারা হুলারহাটে নেমে নির্বিচারে গুলি করে এবং বাড়িঘর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়। এরপরে প্রতিদিন পাকবাহিনী নির্বিচারে গুলি চালাতে থাকে নিরীহ বাঙালিদের ওপর। হত্যা, নারী নির্যাতন, ঘরবাড়ি জ্বালানো, লুটপাট করা তাদের নিত্যদিনের রুটিনে পরিণত হয়। পাকবাহিনীকে সহযোগিতা করে তাদের এদেশীয় দোসর কুলাঙ্গার রাজাকারেরা। প্রতি রাতে পাকবাহিনী তাঁদের দোসর কুলাঙ্গারদের সহযোগিতায় মেয়েদের ধরে নিয়ে নির্যাতন চালিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। এদিকে মাসব্যাপী মুক্তিযোদ্ধারা পাকসেনাদের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল, পাকসেনাদের ভারী অস্ত্রের নিকট তা কর্পুরের মতো হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে মুক্তিযোদ্ধারা। এ অবস্থায় শহরে থাকা নিরাপদ নয় ভেবে মে মাসের মাঝামাঝি অঞ্জু তাঁর পরিবারের সাথে পিরোজপুর থেকে সাত কিলোমিটার দক্ষিণে তাঁদের গ্রামের বাড়ি নামাজপুরে চলে যান।

একাত্তরের সামাজিক অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের মতো যুবতী মেয়েদের জন্য কাজ করা ছিল অত্যন্ত দুরূহ। একদিকে নরঘাতক পাকসেনা অন্যদিকে সামাজিক বাধা। এ সব বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে শুধুমাত্র দেশের জন্য আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি।'

নামাজপুর গ্রামে তাঁদের বাড়িতে থেকে অঞ্জু নানাভাবে চেষ্টা করতে থাকেন সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য। সেপ্টেম্বর মাসে তিনি পুনরায় মুক্তিযোদ্ধাদের

সন্ধান পান এবং তাদের সাথে কাজ শুরু করেন। এ সময়ে তাকে সহযোগিতা করেন জাহানারা বেগম আলো। অঞ্জু ইনফরমার হিসেবে কাজ শুরু করেন। বিভিন্ন ছদ্মবেশ ধারণ করে গ্রামের পর গ্রাম ঘুরে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাদ্য ও অর্থ সংগ্রহ করেছেন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের দিয়েছেন। এছাড়া তিনি কমান্ডারের নির্দেশে আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতেন। তিনি বিভিন্ন তথ্য মুক্তিযোদ্ধা আলো, পুলক ও কামালের মাধ্যমে সরবরাহ করতেন। স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত তাঁকে দেয়া মুক্তিযুদ্ধের প্রতিটি দায়িত্ব তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন।

স্বাধীনতার পরে ১৯৭৪ সালে পিরোজপুর গার্লস হাইস্কুল থেকে এসএসসি পাশ করেন তিনি। এরপর কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম থানার বড়দোইন গ্রামের মতিউর রহমানের সাথে তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। বর্তমানে তাঁর এক ছেলে ও এক মেয়ে।

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পেরেছেন বলে তিনি আনন্দিত এবং গর্বিত। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি যোগ্য মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য তিনি দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।

সালেহা বেগম
(বাগেরহাট)

পুরুষের পাশাপাশি এদেশের নারীরা নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন মুক্তিযুদ্ধের সময়। কেউ সশস্ত্রযোদ্ধা, কেউ নার্স, কেউ সাংস্কৃতিককর্মী, কেউ সংবাদকর্মী, কেউ রাঁধুনি আবার কেউ ইনফর্মারসহ নানা ধরনের কাজ করে মুক্তিযুদ্ধে অবদান রেখেছেন। এছাড়াও বিভিন খবরাখবর পত্রিকায় প্রকাশ করে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ক্যাম্পে বিলি করে মুক্তিযোদ্ধাদের মাধ্যমে বর্বর পাকবাহিনীর নৃশংস নির্যাতন এবং যুদ্ধের সাফল্য ও বাস্তব চিত্র বিভিন্ন দূতাবাসের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন বহির্বিশ্বের কাছে। এ সমস্ত পত্রপত্রিকা যুদ্ধক্ষেত্রে এবং আন্তর্জাতিকভাবে মুক্তিযুদ্ধকে আরো গতিশীল করেছে, তুলে ধরেছে প্রকৃত চিত্র। এর ফলে একদিকে যেমন বহির্বিশ্বের সমর্থন পাওয়া সহজ হয়েছে অন্যদিকে মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনই একটি পত্রিকার নাম 'মায়ের ডাক', যার সম্পাদনা করেছেন মুক্তিযোদ্ধা সালেহা বেগম। সালেহা বেগম নিজে সশস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়ে কখনো সংগঠক, কখনো যোদ্ধা আবার কখনো মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা দানকারী মহীয়সী নারী হিসেবে কাজ করেছেন মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়।

সালেহা বেগমের জন্ম ১৯৪৪ সালের ৩ সেপ্টেম্বর। তাঁর বাবা ইস্‌হাক শেখ এবং মা জোবায়দা খাতুন। তাঁর জন্ম বাগেরহাট সদর থানার কান্দাপাড়া গ্রামে। চার ভাইবোনের মধ্যে সালেহা বেগম সবার ছোট। মুক্তিযুদ্ধের সাথে তাঁর সম্পৃক্ততা আছে জেনে অনেক খোঁজাখুঁজির পর তাঁর সন্ধান মেলে ঢাকার মালিবাগ ওয়ার্লেস কলোনির পাশে। তিনি বর্তমানে থাকেন একটা ভাড়াটে বাসায়। কথা হয় মুক্তিযোদ্ধা সালেহা বেগমের সাথে।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুক্তিযোদ্ধা সালেহা বেগম এম.এ পড়ছিলেন। তাঁর ভাই শেখ আব্দুর রহমান ছিলেন তখন পার্লামেন্ট সদস্য। সালেহা বেগম একাত্তরে সক্রিয়ভাবে ছাত্রলীগের সাথে জড়িত ছিলেন। মহান মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পূর্বেই পাকিস্তানিদের দুঃশাসন ও শোষণ সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল স্পষ্ট। যুদ্ধ শুরুর প্রথম দিকে বাগেরহাটে

তাঁদের বাসাটা ছিল মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য রিক্রুট অফিস। তাঁদের বাসায় মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলাপ-আলোচনা হতো। তখন থেকেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শ বিষয়ে তিনি দিক্ষিত হন।

বাগেরহাটে পাকমিলিটারির এবং রাজাকার ও তাদের এদেশীয় সহযোগীদের দাপট শুরু হয় এপ্রিল মাসের প্রথম থেকে। তারা বাগেরহাট ত্যাগ করে ভারতে যান মে মাসের প্রথম দিকে। বাগেরহাট ত্যাগ করার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা হান্নান ও ক্যাপ্টেন তাজুল ইসলামের সাথে সরাসরি কাজ করেছেন ইনফর্মার ও খাদ্য সংগ্রহকারী হিসেবে। এছাড়া বাগেরহাটে মুক্তিযুদ্ধের সদর দফতর হিসেবে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য সালেহা বেগমের বাসা ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁদের বাসায় সদর দফতর থাকাকালীন তিনি দফতর সম্পাদিকা হিসেবে কাজ করেছেন। পাকমিলিটারি ও রাজাকারদের বাগেরহাটে যখন তৎপরতা বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন তিনি বাগেরহাট ত্যাগ করেন। নানা বাধা ও প্রতিকূলতার ভেতর দিয়ে তিনি ভারতে চলে যান মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে।

ভারতে প্রবেশের পরে তিনি প্রথম যোগাযোগ করেন টাকি ক্যাম্পে। মেজর মেহেদী ও সেক্টর কমান্ডার জলিলের সাথে পারিবারিকভাবে তাদের সম্পর্ক ছিল বলে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করতে তাঁর পক্ষে খুব একটা বেগ পেতে হয় নি।

তিনি প্রথমে সংগঠক ও পরে দেড় মাসের একটা সশস্ত্র প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি যে সমস্ত আগ্নেয়াস্ত্রের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন তার মধ্যে পিস্তল ও গ্রেনেড এবং বিভিন্ন প্রকার বিস্ফোরক দ্রব্যের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য।

এরপর জুলাই মাসের শেষ দিকে ২০জন মেয়ের প্রথম ব্যাচ প্রশিক্ষণ শেষে বাংলাদেশে প্রবেশের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। পরে তিনি বিভিন্ন শরণার্থী ক্যাম্পে যুবক ছেলে-মেয়েদের উদ্বুদ্ধ করেন মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য। যুদ্ধের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরার জন্য পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন। সে অনুযায়ী ছালেহা তাঁর কয়েকজন সহযোগী নিয়ে 'মায়ের ডাক' নামে একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা প্রথমে প্রকাশিত হয় ১৬ অক্টোবর ১৯৭১। পত্রিকার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ১৭। পত্রিকাটি মুজিবনগর বাংলাদেশ থেকে মুদ্রিত এবং শ্রীমতী নীলা দে কর্তৃক প্রকাশিত এবং সালেহা বেগম কর্তৃক সম্পাদিত ছিল। পনের পয়সা মূল্যের এ পত্রিকার তখন সার্কুলেশন ছিল দুই হাজার কপির উপরে। দেশ স্বাধীনের পূর্ব পর্যন্ত এ পত্রিকা প্রকাশিত হয় এবং মুজিবনগর সরকারের বিভিন্ন দফতর, দূতাবাস, শরণার্থী ক্যাম্প ও বিভিন্ন অঞ্চলসহ সম্ভব সকল জায়গায় বিলি করা হতো। পত্রিকাটির সফল প্রকাশনাসহ এর কলেবর বৃদ্ধি, সংবাদ সংগ্রহ, পত্রিকা সরবরাহের কাজে তিনি নিরন্তর সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় পত্রিকাটি সফলভাবে প্রকাশিত হয়েছে এবং সকল মহলের নিকট সমাদৃত হয়েছে।

১৯৭৪ সালে তিনি এমএ পাশ করেন। এরপর সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজসেবা কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেন। বর্তমানে তিনি অবসর গ্রহণ করেছেন এবং বেশ কয়েকটি সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত আছেন।

বাংলাদেশকে একটি দারিদ্র্য, সন্ত্রাসমুক্ত এবং অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে দেখতে চান ছালেহা।

রোকেয়া হোসেন
(মঠবাড়িয়া)

দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার দক্ষিণ অঞ্চলের প্রতিনিধি নাছিম উদ্দিন এবং ৯ নং সেক্টরের সাব-সেক্টর কমান্ডার মেজর জিয়াউদ্দিনের কাছ থেকে জানতে পাই মুক্তিযোদ্ধা রোকেয়া হোসেনের কথা। রোকেয়া হোসেনের খোঁজে ১৪ অক্টোবর ২০০২ তারিখে রওনা হই পিরোজপুর থেকে মঠবাড়িয়ার উদ্দেশে। বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী জেলা পিরোজপুর। এককালে পিরোজপুর থেকে মঠবাড়িয়া যাওয়ার জন্য লঞ্চই ছিল একমাত্র মাধ্যম। ইদানীং লঞ্চের চেয়ে বাসে দ্রুত যাওয়া যায়। মঠবাড়িয়া থানার উত্তরে ভান্ডারিয়া, দক্ষিণে বরগুনা জেলা এবং বঙ্গোপসাগর, পূর্বে বরগুনা জেলার বাসনা থানা এবং পশ্চিমে বাগেরহাট জেলার শরণখোলা থানা ও সুন্দরবন এলাকা। মুক্তিযুদ্ধের সময় মঠবাড়িয়া থানা ছিল ৯ নং সেক্টরের আওতাভুক্ত। এই ৯নং সেক্টরের আওতায় যুদ্ধ করেছেন মুক্তিযোদ্ধা রোকেয়া হোসেন।

একাত্তরে রোকেয়া হোসেন এসএসসি পরীক্ষার্থী ছিলেন। থানা পর্যায়ের বিভিন্ন রাজনৈতিক সভাসমাবেশে নিয়মিত যোগ দিতেন স্কুল পড়ুয়া রোকেয়া হোসেন। স্কুলজীবন থেকে তিনি ছিলেন রাজনীতি সচেতন। 'পাকিস্তানিরা বাঙালিদের শাসন ও শোষণ করছে'— এই সহজ কথাটি সহজভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। একাত্তরের মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে পাকবাহিনী মঠবাড়িয়া প্রবেশ করে। সারাদেশের মতো পাকবাহিনী ও তাদের এদেশীয় কুলাঙ্গার দোসররা মঠবাড়িয়া থানার বিভিন্ন গ্রামে নির্মমভাবে নির্যাতন ও অত্যাচার চালায়।

রোকেয়া হোসেন ১৯৫৭ সনের ১ জানুয়ারি বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ থানার ভুতেরদিয়ে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা নূরনবী আনছারী ছিলেন ব্যবসায়ী এবং মা আছিয়া বেগম ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এ চাকুরি করতেন। তিন ভাই ও তিন বোনের মধ্যে রোকেয়া হোসেন বড়। ছেলেবেলা থেকেই রোকেয়া হোসেন ছিলেন শান্ত ও মেধাবী।

মুক্তিযুদ্ধের সময়ে মঠবাড়িয়া সি.ও অফিসের সামনে সার্কেল অফিসার মাখনলাল দাস এবং ললিত বল নামে দু'জন সম্মানিত ব্যক্তিকে মিলিটারি নির্মমভাবে হত্যা করে। দিনেরবেলা মানুষের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়া এবং রাতেরবেলা মেয়েদের

ধরে নিয়ে নির্যাতন চালানো মিলিটারির নিয়মিত রুটিন কাজে পরিণত হয়। দিন যতই গড়ায়, মিলিটারির নির্যাতনের মাত্রা ততই বৃদ্ধি পায়। দেশের এই ভয়াবহ অবস্থায় নিজেকে নিরাপদ মনে করেন নি রোকেয়া হোসেন বেবী ও তাঁর বোন রোজিনা আনসার হ্যাপি। দুই বোন তাদের নিরাপত্তার জন্যই মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেন। তাঁরা নানাভাবে সুযোগ খুঁজতে থাকেন মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য।

মঠবাড়িয়া এলাকার সাব-সেক্টর কমান্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন মেহেদী আলী ইমাম। ক্যাপ্টেন মেহেদীর সেকেন্ড ইন কমান্ড ছিলেন আলমগীর হোসেন। এই আলমগীর হোসেনের সাথে রোকেয়া হোসেনের পূর্ব পরিচয় ছিল। সেই পরিচয়ের সুবাদে রোকেয়া হোসেন ও তার বোন রোজিনা আনছারী হ্যাপি আলমগীর হোসেনের নিকট যান এবং মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। আলমগীর হোসেন প্রথমে তাঁদেরকে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান থেকে বিরত করার চেষ্টা করলেও রোকেয়ার মনোবল ও আগ্রহে মুগ্ধ হন এবং মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের অনুমতি দেন। কমান্ডার আলমগীরের অনুমতি নিয়ে রোকেয়া জুলাই মাসের প্রথম দিকে অভিভাবকদের অনুমতি না নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন।

রোকেয়া হোসেন বুকাবুনিয়া ক্যাম্পে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। বুকাবুনিয়া বর্তমান বরগুনা জেলার বামনা থানার একটি ইউনিয়ন। বুকাবুনিয়া ক্যাম্পে রোকেয়া আগ্নেয়াস্ত্রের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। আগ্নেয়াস্ত্রের মধ্যে ছিল থ্রি নট থ্রি রাইফেল, রিভলভার, গ্রেনেড এবং বিভিন্ন ধরনের বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহার। তিনি ছদ্মবেশ ধারণ বিষয়ক প্রশিক্ষণও গ্রহণ করেন।

তিনি ছদ্মবেশ ধারণ করে তথ্য সংগ্রহ ও রেকির কাজ করেন। ক্যাম্পে গোলাবারুদ রক্ষণাবেক্ষণ, যুদ্ধস্থলে অস্ত্র-গোলাবারুদ পৌঁছে দেয়ার দায়িত্বও সুচারুভাবে পালন করেন তিনি। তিনি পাথরঘাটা, বরগুনা ও পটুয়াখালি ক্যাম্পে থেকেও তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর ওপর অর্পিত ক্যাম্পের বিভিন্ন দায়িত্বের প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত যত্নশীল। তাঁর কাজের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে কমান্ডার অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিতেন। দক্ষতার সাথে তাঁর দায়িত্ব পালন করায় বহুবার প্রশংসিত হয়েছেন রোকেয়া।

মুক্তিযুদ্ধের পরে ১৯৭২ সালে হাতেম আলী গার্লস হাইস্কুল থেকে এসএসসি এবং ১৯৭৪ সালে ইডেন কলেজ থেকে এইচ এস সি পাশ করেন। পরে মঠবাড়িয়া থানার সাপলেজা গ্রামের মোঃ বেলায়েত হোসেনের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন তিনি। বর্তমানে রোকেয়া হোসেন এক ছেলে ও এক মেয়ের জননী।

যুদ্ধের একত্রিশ বছর পরে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন তিনি। মুক্তিযোদ্ধাদের যোগ্য মর্যাদা ও সম্মান দেওয়ার জন্য এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরে তাঁদেরকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

মোমেলা বেগম
(কোটালিপাড়া)

হেমায়েত বাহিনীর প্রধান মুক্তিযোদ্ধা হেমায়েত উদ্দিন বীর বিক্রম এবং মুক্তিযোদ্ধা আশালতা বৈদ্যের কাছ থেকে জানতে পাই মুক্তিযোদ্ধা মোমেলা বেগমের কথা। হেমায়েত উদ্দিনের ছোট বোন মুক্তিযোদ্ধা মোমেলা। ঘর-সংসার ছেড়ে জীবনের মায়া ত্যাগ করে স্বামী-স্ত্রী দেশ মাতৃকার মুক্তির জন্য সশস্ত্র সংগ্রামে যোগ দেন।

মুক্তিযোদ্ধা মোমেলা বেগম ১২ এপ্রিল ১৯৫০ সালে কোটালিপাড়া থানার কুশলা ইউনিয়নের টুপুরিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা আব্দুল করিম মুন্সি ছিলেন কৃষক এবং মা সখিনা বেগম গৃহিণী। তিন ভাই এবং দুই বোনের মধ্যে মোমেলা বেগম ছোট। তাঁর সংবাদ পাই আশালতা বৈদ্যের নিকট থেকে। তাঁর সঙ্গে দেখা হয় তাঁর বাড়িতে।

একাত্তরে মুক্তিযোদ্ধা মোমেলা বেগমের বয়স একুশ বৎসর এবং তিনি বিবাহিতা। তাঁর বিয়ে হয় কোটালিপাড়া থানার কুশলা ইউনিয়নের সেনেরগাতি গ্রামের বাদশা মিয়া তালুকদারের সাথে।

তাঁর ভাই হেমায়েত উদ্দিন মার্চ মাসে দেশে আসেন এবং নিজেই সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য ও এলাকার যুবকদের নিয়ে দল গঠন করেন, যা পরবর্তী সময়ে হেমায়েত বাহিনী নামে পরিচিতি লাভ করে। হেমায়েত উদ্দিন দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য পাকসেনাদের বিরুদ্ধে দলগঠন করার কারণে পাকিস্তানি মিলিটারি মোমেলাদের বাড়িঘর আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয় এবং বারবার তাঁদের বাড়িতে হানা দেয়। পাকসেনারা প্রায়ই মোমেলার বাবা, ভাইসহ পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে খোঁজ করতে থাকে। বাধ্য হয়ে তাঁরা তখন কোটালিপাড়া বিলের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে চলে যান। মে মাসের প্রথম দিকে হেমায়েত উদ্দিনের পরামর্শে তাঁর বোন মোমেলা বেগম নারী মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। কার্যত হেমায়েত উদ্দিন দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে দলগঠন করলে পাকসেনা ও তাদের দোসররা প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। পাকসেনারা হেমায়েতউদ্দিন ও তার আত্মীয়-

স্বজনদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। তখন তাদের গোটা পরিবারের বেঁচে থাকা ছিল একটা চ্যালেঞ্জ। তাই পরিবারের সকলেই মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

তাঁদের প্রশিক্ষণের মেয়াদ ছিল একমাস। তিনি রাইফেল চালনা ও গ্রেনেড ছোড়ায় প্রশিক্ষণ নেন। তাঁকে প্রশিক্ষণ দেন হেমায়েত উদ্দিন, কমলেশ বাবু ও বাদশা মিয়া। হেমায়েত উদ্দিনের তত্ত্বাবধানে আগ্নেয়াস্ত্র চালনার পাশাপাশি তিনি সেবিকার প্রশিক্ষণও গ্রহণ করেন। সেবিকা হিসেবে প্রশিক্ষণ দেন ডাক্তার রণজিৎ ব্যানার্জি।

মুক্তিযুদ্ধের সময় ক্যাম্পে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন মোমেলা। যুদ্ধ চলাকালে তিনি পয়সারহাট, কুমারিয়া, রামশীল, জহুরকান্দি, টুংগিপাড়া, কোটালিপাড়াসহ বিভিন্ন ক্যাম্পে অবস্থান করেছেন এবং তাঁর ওপর অর্পিত বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তিনি বিভিন্ন ছদ্মবেশ ধারণ করে রেকির কাজ করেছেন। এছাড়া সশস্ত্র যুদ্ধে অস্ত্র ও গোলাবারুদ যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছে দিয়েছেন। নার্সিং কাজেও মোমেলা ছিলেন বিশেষ পারদর্শী। মোমেলার সাহসিকতায় ও প্রত্যেকটি দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে পালনের জন্য কমান্ডার হেমায়েত উদ্দিন, কমলেশ বাবু ও বাদশা মিয়া তাঁর প্রতি অত্যন্ত খুশি ছিলেন। মোমেলার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে কমান্ডার ক্যাম্পের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিতেন তাঁকে। তিনি সশস্ত্র ক্যাম্প পাহারা দিতেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগপর্যন্ত তিনি তাঁর দায়িত্ব গুরুত্বের সাথে পালন করেন। তিনি ক্যাম্পে বিভিন্ন সময় রান্নাবান্নার কাজও করেছেন। এছাড়াও তিনি বেশ কয়েকটা যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে টুপুরিয়ার যুদ্ধ, রামশীলের যুদ্ধ, শিকিরবাজারের যুদ্ধ ও ঘাঘর বাজার যুদ্ধ বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য।

বর্তমানে মোমেলার দুই ছেলে ও ছয় মেয়ে। ছেলে-মেয়েদের বিয়ে হয়েছে। মোমেলা নিয়মিত অনুদান পাচ্ছেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'একাত্তরে সর্বস্ব হারিয়ে আমরা চেয়েছিলাম একটা দারিদ্র্য, সন্ত্রাস ও রাজাকারমুক্ত সমাজ। কিন্তু সে আশা পূরণ হলো না। আজ অমুক্তিযোদ্ধাদের ভিড়ে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধারা অবহেলার শিকার হয়েছে। আর সহযোগিতার নামে মুক্তিযোদ্ধাদের যা দেয়া হচ্ছে তা স্রেফ অনুগ্রহ বা করুণা। আমি মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান ও মর্যাদা চাই।'

কাঞ্চনমালা
(লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ)

এদেশের নারীরা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়। তবে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধ করেছেন এমন নারীদের সংখ্যা খুব বেশি হবে না। যে কয়েকজন নারী মহান মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র অংশগ্রহণ করেছেন— তাদের কথা এ প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা খুব একটা জানে না। প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের জানানোর জন্য গত ৩২ বছরে উল্লেখ্যযোগ্য কোনো ধরনের প্রচেষ্টা কোনো সরকারই গ্রহণ করে নি। তাই প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের কাঁধে দোষ চাপিয়ে আর লাভ কী ? লোকমুখে কাঞ্চনমালা নামের একজন সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধার সংবাদ পাই লৌহজং-এ। এর ভিত্তিতে কাঞ্চনমালার সন্ধানে মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং-এ পৌঁছাই গত বর্ষা মৌসুমে। বিভিন্নভাবে খোঁজাখুঁজির পরেও লৌহজং-এ কাঞ্চনমালার খোঁজ পাওয়া গেল না। যারা তাকে এক সময় চিনতেন, তারা আজ তাঁর ঠিকানা জানেন না।

অবশেষে বিভিন্ন সূত্রে কাঞ্চনমালার খোঁজ মেলে মিরপুরে। কথা হয় কাঞ্চনমালার সাথে। ১৯৫১ সালের বর্ষা মৌসুমে লৌহজং থানার কমলা ইউনিয়নের ডহরী গ্রামে তাঁর জন্ম হয় । তাঁর বাবা কালু খাঁ আর মা মাফিয়া খাতুনের খুব আদরের সন্তান কাঞ্চন।

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে তাঁর সম্পৃক্ততার কথা জানতে চাইলে তিনি জানান— মুক্তিযুদ্ধের দু'বছর পূর্বে তাঁর বিয়ে হয়, নেত্রকোনা জেলার দুর্গাপুর থানার বিরিশিরি গ্রামে। এক সময় তাঁর স্বামীর বাড়ি ছিল লৌহজং থানার ধাইদা গ্রামে। পদ্মা নদীর ভাঙনের পরে তার স্বামী হারুন-উর-রশিদ পরিবার পরিজনের সাথে নেত্রকোনা জেলার দুর্গাপুর থানার বিরিশিরিতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। বিয়ের পরেই তিনি তাঁর স্বামীর বাড়ি বিরিশিরিতে চলে যান। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করতে থাকেন কাঞ্চন। এরই মধ্যে এক ছেলে সন্তানের মা হন তিনি ।

কোন মাস হবে তাঁর সঠিক মনে নেই, তবে বর্ষা ছিল। দুপুরবেলা খেতে বসেছে কাঞ্চন। আট মাসের একমাত্র ছেলেটি তাঁর শাশুড়ির কোলে ছিল। তাঁর

স্বামী দুপুরের খাওয়া শেষে বাজারে গেছে। এমন সময় চিৎকার শুনতে পেলেন কাঞ্চন। মিলিটারি আসছে! মিলিটারি আসছে! কাঞ্চন শুনেছিলেন পাক মিলিটারিরা শুধু হিন্দু বাড়িতে অত্যাচার করে, ওরা মুসলমানদের কিছু বলে না; তাঁদের বাড়ির পাশের রাজাকার আঃ ছাত্তার এমন কথাই শুনিয়েছেন গ্রামবাসীকে কিন্তু ঐদিন পাকসেনারা এলোপাতাড়িভাবে গুলি করতে করতে গ্রামে ঢুকে পড়ে, বিভিন্ন বাড়িতে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয় তারা। পাকসেনাদের তাণ্ডবে গ্রামের সবাই পালাতে থাকে। পাক মিলিটারিদের ভয়ে তাঁর একমাত্র বাচ্চাটাকে নিয়ে পালিয়ে যায় তাঁর শাশুড়ি। পাক মিলিটারিদের তাণ্ডবে হতবাক কাঞ্চন। ঘর থেকে বের হয়ে পাশের বাড়ির দিকে পালাতে থাকেন দিশাহারা কাঞ্চন, এসময় এলাকার কুখ্যাত রাজাকার আঃ ছাত্তারের ইশারায় পাক মিলিটারিরা ধরে ফেলে তাঁকে। শত আঁকুতি-মিনতি করে নিজেকে বাঁচানোর জন্য হায়নাদের হাতে ধরে, পায়ে ধরে, কান্নাকাটি করে, ধর্মের বাবা বলে কিন্তু সেদিন কাঞ্চনকে ছেড়ে দেয় নি হায়নার দল। তাঁকে ঠেলে ধাক্কিয়ে গাড়ির নিকট নিয়ে যায় পাকসেনারা। মেজর জাহিদ কাঞ্চনকে ধাক্কা মেরে গাড়িতে উঠায়।

বিরিশিরি গ্রামের নিকট, শিবগঞ্জ বাজারের পাশের স্কুলে ছিল মিলিটারিদের ক্যাম্প। প্রথমে কাঞ্চনকে মারতে মারতে একটা ঘরের ভেতরে নিয়ে যায় এবং খুঁটির সাথে বেঁধে রাখে। বাহিরে ঝমঝম বৃষ্টি পড়ছিল। সারা বিকাল কান্নাকাটি করেছেন তিনি। একসময় জ্ঞান হারান কাঞ্চন। জ্ঞান ফিরলে দেখতে পান ঘরের মধ্যে একটা টিনের থালায় দু'টো শুকনা রুটি আর দু'টুকরা মাংস। কখন কে রেখে গেছে প্রহরের ঘোরে ঠাহর পান নি কাঞ্চন।

রাতে মেজর জাহিদ তাঁর কাছে আসে এবং জোরপূর্বক পাশবিক নির্যাতন চালায় তাঁর অবশ দেহটার উপর। আত্মরক্ষার জন্য আবার বেদম মার খেতে হয় তাঁকে। মারের ঘোরে আবার জ্ঞান হারান তিনি। পরের দিন রাজাকার ছাত্তার পাকসেনাদের ক্যাম্পে আসে। কাঞ্চন এক মিলিটারির সহযোগিতায় রাজাকার ছাত্তারকে ডেকে আনেন এবং অনুনয়-বিনয় করেন তাঁকে ছাড়িয়ে নেয়ার জন্য। কাঞ্চনের কান্নায় আকাশ বাতাস ভারী হলেও, কুলাঙ্গার রাজাকারের হৃদয় গলে নি। কাঞ্চনের কান্নায় হাসতে হাসতে চলে যায় কুলাঙ্গার ছাত্তার। কান্নায় ভেঙে পড়েন কাঞ্চন। বুঝি তাঁর জীবনের অন্ধকার কেটে কখনো ভোরের আলো দেখা দেবে না। পরিত্রাণ পাবে না সে এই নরকপুরী থেকে। এরপরে প্রায় প্রতিদিন কাঞ্চনকে নির্যাতন করেছে মেজর জাহিদ। নির্যাতনে বাধা দিলে মেজর জাহিদ কাঞ্চনের স্বামী এবং সন্তানকে মেরে ফেলতে চাইত। বাঙালি মেয়েরা সব শোক, সব দুঃখ সইতে পারে, কিন্তু সইতে পারে না স্বামী হারানোর কষ্ট, সন্তান হারানোর ব্যথা। স্বামী-সন্তান হারানোর ভয়ে পাশবিক নির্যাতন নীরবে সহ্য করেছেন তিনি। কাঞ্চনকে ওরা শাড়ি পরতে দেয় নি; যাতে আত্মহত্যা করতে না পারে।

অধিকাংশ সময় পেটিকোট ও ব্লাউজ পরেন তিনি। ওই ক্যাম্পে তিনি আঠার দিন অসহনীয় নির্যাতন ভোগ করেছেন। এ সময় তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, প্রতিরাতে মেয়েদের ধরে নিয়ে আসত এবং নানাভাবে নির্যাতন করত, এরপর এক বা দুই রাত পরে অন্যত্র নিয়ে যেত। ওরা কোথায় নিয়ে যেত তা আজও জানে না কাঞ্চন। যাদেরকে নিয়ে গিয়েছে তাদেরকে আর কখনো ফিরিয়ে আনে নি। অধিকাংশ সময় তারা মেয়েদের বিবস্ত্র করে রেখেছে এবং যথেচ্ছা ব্যবহার করেছে। তিনি যেহেতু মেজরের আওতায় ছিলেন, সেহেতু তাঁর ওপর অন্যান্য সিপাহিরা নির্যাতন চালাত না।

মেজরের কু প্রস্তাবে রাজি না হলে মেজর নানাভাবে প্রলোভনও দেখাত তাঁকে, এরপরেও রাজি না হলে তাঁকে মারধর করত। ধরে নেয়ার ১৭-১৮ দিন পরে, একদিন দুপুরবেলা মেজরের প্রস্তাবে বাধা দিলে মেজর কাঞ্চনকে বেদম প্রহার করে। অজ্ঞান হয়ে পড়েন তিনি। মেজর জরুরি কাজে অন্যত্র চলে গেলে, অন্যান্য মিরিটারিরা সেদিন কাঞ্চনের ঘরের দরজা বন্ধ করে নি। জ্ঞান ফিরলে অবস্থা বুঝে তিনি চট করে ঘরের পিছন দিয়ে পালাতে থাকেন। পেছনে পেছনে মিলিটারিরা ধাওয়া করে কাঞ্চনকে। দৌড়াতে দৌড়াতে সোমেস্বরী নদীর কাছে পৌঁছায় কাঞ্চন। ওরা তাঁকে পায়ে গুলি করে। গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। পাকসেনারা তাঁকে বেদম প্রহার করে। খবর পেয়ে ছুটে আসে মেজর জাহিদ। রাগে ক্রোধে মেজর জাহিদ তাঁর গলার উপর বুটজুতা দিয়ে সজোরে মাড়িয়ে দেয়, তাঁর নাক-মুখ থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরতে থাকে। এক পর্যায়ে জ্ঞান হারায় কাঞ্চন। তখন পাকসেনারা কাঞ্চনকে মৃত ভেবে ফেলে দেয় নদীর পাড়ে।

জ্ঞান ফিরে দেখেন বারইকান্দি ক্যাম্পে শুয়ে আছেন তিনি। পরে তিনি শুনতে পান তাঁর শ্বশুরবাড়ির পাশের গ্রামের কাঞ্চন নামের এক ছদ্মবেশী মুক্তিযোদ্ধা সন্ধ্যায় ঐ নদীর পাড় দিয়ে যাবার সময় তাঁকে জীবিত দেখতে পেয়ে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন বারইকান্দি মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে। ক্যাম্পে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়ার পরে ভারতের তুরা মেডিকেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয় কাঞ্চনকে। প্রায় এক মাস চিকিৎসার পরে সুস্থ হয়ে ওঠেন কাঞ্চন।

দেশে তখন চলছে ভয়াবহ যুদ্ধ। স্বামী-সন্তান কোথায় আছে, কেমন আছে, জানে না কাঞ্চন। অক্টোবর মাসের শেষ দিকে কাদের সিদ্দিকীর বোন রহিমা সিদ্দিকীর সহায়তায় মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন তিনি।

তিনি প্রশিক্ষণ নেন ভারতের তুরা ক্যাম্পে এবং পরে স্থানীয়ভাবে টাংগাইল জেলার ঘাটাইল মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে। স্থানীয় কমান্ডার ফজলুল হক এবং রহিমা সিদ্দিকীর নিকট থেকে প্রশিক্ষণ পেয়ে সমরাস্ত্র বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেন তিনি। নার্স হিসেবে প্রশিক্ষণ পান মাধুরী নামের ভারতের একজন নার্সের কাছ থেকে। মাধুরী অত্যন্ত যত্ন সহকারে তাঁকে নার্সের কাজ শিখিয়েছিলেন। বিভিন্ন কাজে

মাধুরীর নিকট থেকে সহযোগিতা পেতেন তিনি। যে সমস্ত সমরাস্ত্রের প্রশিক্ষণ তিনি গ্রহণ করেন, তারমধ্যে রাইফেল ও গ্রেনেড চালনা এবং বিভিন্ন বিস্ফোরক দ্রব্যের ব্যবহার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

যুদ্ধ চলাকালে টাংগাইল ও ঘাটাইলে অবস্থান করেছেন তিনি। সরাসরি তিনি মির্জাপুরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের সাক্ষ্য রাখেন। ওই যুদ্ধে কমান্ডার ছিলেন ফজলুল হক। সহযোদ্ধাদের মধ্যে রহিমা সিদ্দিকী, মিতালী, সাইফুল ইসলাম, সেলিম, মোহাম্মদ আলী, আলতাফ হোসেন এদের কথা মনে পড়ে তাঁর। সে সময় ক্যাম্পে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের মাতৃস্নেহে চিকিৎসা করে প্রশংসিত হয়েছেন কাঞ্চন মালা। তাঁর সেবায় সেরে উঠে আহত যোদ্ধারা শত্রুবক্ষ ঝাঁঝরা করে ছিনিয়ে এনেছেন স্বাধীনতা। যুদ্ধের বিভীষিকাময় দিনগুলোতে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য গ্রাম থেকে খাদ্য সংগ্রহ করা, বিভিন্ন ছদ্মবেশ ধারণ করে কমান্ডারকে তথ্য সরবরাহের কাজে কাঞ্চনের জুড়ি মেলা ভার।

স্বাধীনতার পরে তাঁর জীবনে আর এক অধ্যায় সূচিত হয়। দেশ স্বাধীন হয়, কে কোথায়, কেমন আছে জানেন না তিনি। সন্তান এবং স্বামী কারও খোঁজ নেই এই বীর মুক্তিযোদ্ধার কাছে। এক স্বল্প পরিচিত লোকের মাধ্যমে সন্তানের ভুল সংবাদ পেয়ে কাঞ্চন পাগলের মতো প্রায়। তিনি ছুটে যান বাবার বাড়িতে। সেখানে সন্তানকে না পেয়ে ছুটে যান সন্তানের টানে স্বামীর বাড়িতে। তাঁর স্বামী কুকুরের মতো দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয় তাঁকে। কাঞ্চন নষ্ট হয়ে গেছে; সে ক্যাম্পে থেকেছে, মুক্তিযুদ্ধ করেছে, সে ভালো নেই। সুতরাং কাঞ্চনকে নিয়ে তাঁর স্বামী সংসার করতে চায় না। এক পর্যায়ে তাঁর ভাসুর, খালু শ্বশুর ও শ্বশুরবাড়ির অন্যান্য লোকজন, আত্মীয়স্বজনসহ মুক্তিযোদ্ধাদের চাপের মুখে কাঞ্চনকে মেনে নিতে বাধ্য হয় তার স্বামী।

দেশ স্বাধীনের পরে সাত-আট বছর তিনি স্বামীর সংসারে থেকেছেন বটে কিন্তু প্রতি কথায় তাঁকে সইতে হয়েছে সীমাহীন গঞ্জনা, মারধর আর অসহনীয় মানসিক যন্ত্রণা। তাঁকে পাকবাহিনী ধরে নিয়েছিল, বিভিন্ন ক্যাম্পে থেকেছে, সে মুক্তিযুদ্ধ করেছে, তাই অপবিত্র হয়ে গেছেন তিনি। তাঁকে নিয়ে আর সংসার করা যাবে না!

১৯৭৯ সালে কাঞ্চন স্বামীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বাবার বাড়ি লৌহজং-এ চলে যান। অবশেষে ১৯৮৩ সালে শত চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে স্বামীর সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন কাঞ্চন। আবার বিয়ে করে তাঁর স্বামী। বাচ্চাদের সৎমা প্রতিনিয়তই কথায় কথায় কাঞ্চনমালার চরিত্র নিয়ে বাচ্চাদের গালমন্দ করে।

স্বামীর সাথে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরে ভাইদের মুখোপেক্ষী হয়ে পড়েন তিনি। বাচ্চাদের পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন সন্তানহারা কাঞ্চন। এক পর্যায়ে তাঁর ভাই এবং ভাসুরদের সহযোগিতায় তিনি বাচ্চাদের ফিরে পান।

কান্নাজড়িত কণ্ঠে কাঞ্চন বলেন, 'আমি তো স্বেচ্ছায় পাকবাহিনীর নিকট যাই নি। আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে। তখন কেন এ সমাজ উদ্ধার করল না? তখন কোথায় ছিল এ সমাজ, কোথায় ছিল আমার স্বামী? যখন যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করলাম, তখনো আমি নষ্ট হলাম না। দেশ স্বাধীনের পরে যখন মুক্তিযুদ্ধে আমার প্রয়োজন শেষ, তখন নষ্ট হয়ে গেলাম! নারী হয়ে জন্মেছি বলে সকল দোষ আমার? তিনি ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে বলেন, 'ভাত দেয়ার মুরাদ নাই, মার দেয়ার গোসাই।'

তিনি বলেন, 'আমরা মুক্তিযুদ্ধ করে স্বাধীনতা পেয়েছি কিন্তু পাই নি অর্থনৈতিক মুক্তি।' এ যুগের ছেলেমেয়েরা পবিত্র জন্মভূমিকে সাম্প্রদায়িকতার কালো থাবা থেকে রক্ষা করবে, রক্ষা করবে জাতিকে, দারিদ্র্য ও ক্ষুধার নৃশংস ছোবল থেকে।

বর্তমানে কাঞ্চনের ২ ছেলে ২ মেয়ে। মেয়েদের বিয়ে হয়েছে। একছেলে আলাদা খায়। আর ছোট ছেলে থাকে কাঞ্চনের সাথে। সে বেকার। কাঞ্চন স্থানীয় মহিলা কমিশনারের বাসায় সামান্য কিছু লেখালেখির কাজ করেন। লেখালেখিতে যা পান তা দিয়ে একবেলা খেলে অন্যবেলা উপোস থাকতে হয়। বিভিন্ন ব্যক্তির সহযোগিতাই মুক্তিযোদ্ধা কাঞ্চনের বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন। বর্তমানে মিরপুরে মেয়ের বাসায় থাকেন অসহায় কাঞ্চন। মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় থেকে পাঁচশত টাকা ভাতা পান। তাও অনিয়মিত।

মমোতাজ বেগম
(যশোর)

বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার তুলনায়, মুক্তিযুদ্ধে যশোরের প্রেক্ষাপট একটু ভিন্ন ধরনের। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর বেশ আগের থেকে যশোরে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়। সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামীলীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেলেও নির্বাচিত দলের কাছে ক্ষমতা ছাড়ে নি ক্ষমতা পিপাসু সামরিকজান্তা ইয়াহিয়া খান। পাক শোষকরা বাঙালিদের কাছে ক্ষমতা দেবে না বরং ভয়ঙ্কর কিছু একটা যে করতে যাচ্ছে, তা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন রাজনীতি বিশেষজ্ঞরা। এসময় কেন্দ্রীয়ভাবে গঠিত হয় ছাত্রলীগের গোপন সংগঠন নিউক্লিয়াস। কেন্দ্রীয় নিউক্লিয়াসের সাংগঠনিক বিকেন্দ্রীকরণে যশোরে নিউক্লিয়াস গঠিত হয়। পাক শাসকগোষ্ঠীর বর্বর শাসন ও শোষণে মমোতাজের মনে তীব্র ঘৃণা ও ক্রোধের সৃষ্টি করে। এই ক্রোধ ও ঘৃণায় প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন তিনি। অভিবাবকদের অনুমতি না নিয়ে মমোতাজ বেগম সক্রিয়ভাবে জড়িত হন যশোর নিউক্লিয়াসের সাথে। নিউক্লিয়াসের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে কাজ শুরু করেন মমোতাজ। তরুণ-তরুণীদের সমরাস্ত্র বিষয়ে দক্ষতার কথা বিবেচনা করে একটি গোপন প্রশিক্ষণ ইউনিট খোলেন যশোর নিউক্লিয়াসের উদ্যোক্তারা

বেজপাড়া কবরস্থানের দক্ষিণ কোণে আব্দুর রশিদ সাহেবের বাগান বাড়িতে ইউনিটের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালানো হতো। অপেক্ষাকৃত গোপন ও নিরাপদ মনে করে এই বাড়িটি বেছে নিয়েছিলেন মুক্তিযোদ্ধারা। অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যগণ, তরুণ ছেলেমেয়েদের সমরাস্ত্রের প্রশিক্ষণ দিয়ে পরিণত করেন চৌকস যোদ্ধায়।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সাথে সরাসরি জড়িত থেকে মমোতাজ সমরাস্ত্র বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেন। রাইফেল, গ্রেনেড ও রিভলভার চালানো বিষয়ে প্রশিক্ষণে দক্ষতা অর্জন করেন তিনি। মমোতাজ বেশি পারদর্শী হন গেরিলা প্রশিক্ষণে। প্রশিক্ষণের প্রতিটি বিষয় অতি যত্ন ও আন্তরিকতার সাথে শেষ করেন তিনি।

মার্চের প্রত্যেকটি দিন মুক্তিযুদ্ধে যশোরের ইতিহাসে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। প্রতিদিন থাকত রাজনৈতিক কোনো না কোনো কর্মসূচি। সভা-সমাবেশ-মিছিলে মুখরিত থাকত যশোরের সড়কগুলো। ৩ মার্চ যশোরের সর্বস্তরের জনতা সমাবেশ শেষে এক বিশাল মিছিল বের করে। মিছিলটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে টেলিফোন ভবনের দিকে যেতেই পাকবাহিনীর গুলিতে চারুবালা নামের এক গৃহবধূ শহীদ হন, আহত হন এক স্কুল ছাত্র। এ মিছিলে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা মমোতাজ বেগম। ২৩ মার্চ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে যশোরের হাজার জনতার উপস্থিতিতে জাতীয় পতাকাকে গার্ড অব অনারের মাধ্যমে উত্তোলন করেন তৎকালীন যশোর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি খান টিপু সুলতান, সাধারণ সম্পাদক রবিউল আলম এবং ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি আলী হোসেন মনি। এরপরে সময় যতই গড়াতেছিল, যশোরে আন্দোলনও ততই বেগবান হচ্ছিল। ২৬ মার্চ পাকবাহিনী শহরের বিভিন্ন স্থানে হানা দেয়। আগুন দেয় মমোতাজদের রেলরোডের বাড়িতে। পাকবাহিনীর অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শহরের অদূরে নিজ গ্রামের বাড়ি চাচড়া ইউনিয়নের মাড়াপোল গ্রামে চলে যান মমোতাজ। সতীর্থ ছালেহা, ফিরোজা, রবিউল আলম ও আব্দুল হাই এসময় আশ্রয় নেন তাদের বাড়িতে। ২৯ মার্চ পাকবাহিনী শহর ছেড়ে সেনানিবাসে চলে যায়। ৩০ মার্চ সেনানিবাসে বাঙালি সৈন্যরা বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন ক্যাপ্টেন হাফিজ ও লেফট্যানেন্ট আনোয়ার। ভীতিকর এক পরিবেশ সৃষ্টি হয় এসময় শহরে। সতীর্থদের সাথে মমোতাজ ফিরে আসেন যশোর শহরে।

দেশ মাতৃকার মুক্তির জন্য যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে ৩০ মার্চ বারন্দিপাড়ায় (ঢাকা রোড ব্রিজের কাছে) বিপুল সংখ্যক জনতা পরিখা খনন করেন। পরিখা খনন কাজে মুক্তি পিয়াসী জনতার সাথে মমোতাজও সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। সুদূর নড়াইল থেকে মুক্তিপাগল হাজার হাজার জনতা সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন পরিখা খনন কাজে। ৪ এপ্রিল একাত্তর, পাকবাহিনী বারন্দিপাড়া আক্রমণ করে। পাকসেনাদের ভারী ও অত্যাধুনিক অস্ত্রের সামনে মমোতাজ ও তাঁর সহযোদ্ধারা বেশিক্ষণ টিকে থাকতে না পেরে যশোর ছেড়ে চলে যান।

১০ এপ্রিল একাত্তর, মমোতাজ ভারতে সিপিএম নেতা আঃ রশিদ সাহেবের বারাসাতের বাড়িতে আশ্রয় নেন। সেখানে কিছুদিন থাকার পরে স্বাধীনতা পিয়াসী মমোতাজ মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য দল গঠনের চেষ্টা করেন। তিনি ও তাঁর সহযোদ্ধা ছালেহা শরণার্থী শিবিরে ঘুরে অনেক চেষ্টা করে সাতজন মেয়ে সংগ্রহ করেন। রবিউল আলম, আলী হোসেন ও আব্দুল হাই-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ওই সাতজন মেয়ের সাথে মমোতাজ গ্রহণ করেন গেরিলা ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ।

আগস্টের প্রথম সপ্তাহে ৮ নং সেক্টরের আওতায় প্রথম সম্মুখ সমরে অংশগ্রহণ করেন তিনি। নাভারণ, চৌগাছা ও বেনাপোলের উত্তর পাশে বাহাদুরপুরে সরাসরি সম্মুখযুদ্ধ করেন তিনি। বাহাদুরপুরে যুদ্ধে মমোতাজ সহযোদ্ধাদের নিয়ে এক নারী ধর্ষণকারী রাজাকারকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। পরে তাঁর সহযোদ্ধারা ওই রাজাকারকে হত্যা করে। যুদ্ধের প্রতিটি ক্ষেত্রে দুঃসাহসিক ভূমিকা রেখেছিলেন মমোতাজ। সুচারুরূপে দায়িত্ব পালনের জন্য কমান্ডারদের নিকট থেকে বারবার প্রশংসিত হন বীরযোদ্ধা মমোতাজ।

এই বীর মুক্তিযোদ্ধা ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন যশোর শহরে ১৫২ রেলরোডের নিজ পিত্রালয়ে। বাবা মরহুম আইনজীবী জাকির হোসেন এবং মা রওশন আরার সুযোগ্য কন্যা মমোতাজ গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে অনন্য অবদান রেখেছেন। চার ভাই, চার বোনের মধ্যে মমোতাজ দ্বিতীয়। যুদ্ধ শেষে মমোতাজ যশোর সরকারি বালিকা বিদ্যালয় থেকে এসএসসি এবং যশোর পলিটেকনিক কলেজ থেকে ডিপলোমা ইন কমার্স পাশ করেন। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সম্মানসহ এম.কম পাশ করেন তিনি। মমোতাজ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন ১৮ মে ১৯৭৮ সালে। তিনি এক সন্তানের মা।

বর্তমানে যশোর বিসিক অফিসে প্রমোশন অফিসার হিসেবে কর্মরত মমোতাজ জাতীয় পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার জন্য জাতির নিকট আহ্বান জানান।

রওশন আক্তার লিলি
(ঢাকা)

একাত্তরে মহান মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের সাথে পুরুষের পাশাপাশি সহযোগিতা করেছেন এদেশের নারীরা। যে-সমস্ত নারী সশস্ত্রযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন, একাত্তরের পর তাদের অনেকেই এখন গ্রামে-গঞ্জে, নীরবে-নিভৃতে দিনযাপন করছেন। এ প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা তাঁদের অনেককেই চেনে না। আবার অনেক নারী মুক্তিযোদ্ধা, সামাজিক কারণে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিতে চান না। কারণ সমাজের অনেকেই নারী মুক্তিযোদ্ধা বলতে বীরাঙ্গনাকে বোঝে। মহান মুক্তিযুদ্ধে বিশাল অবদান রাখার পরেও নিজেকে আড়াল করে রেখেছেন, এমনই একজন নারী রওশন আক্তার লিলি।

রওশন আক্তার লিলির সংবাদ পাই তাঁর বোন মুক্তিযোদ্ধা জাহানারা বেগম আলো এবং ৯ নং সেক্টরের সাব-সেক্টর কমান্ডার মেজর জিয়াউদ্দিনের কাছ থেকে। তাঁর জন্ম ১৬ মার্চ ১৯৫৮ সালে পিরোজপুর জেলার রাজারহাট গ্রামে। বাবা নূরমোহাম্মদ দেওয়ান এবং মা রাবেয়া বেগম। পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে তিনি সর্বকনিষ্ঠ। একাত্তরের মার্চ মাসে তিনি নবম শ্রেণীর ছাত্রী। মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব থেকে পারিবারিকভাবে তিনি ছিলেন রাজনীতি সচেতন। তাঁর অগ্রজ জাহানারা বেগম সরাসরি ছাত্র আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন।

২৫ মার্চের পরে মফস্বল শহরগুলোতে পাকসেনাদের প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়। এই প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে সূচনা হয় মুক্তিযুদ্ধের। পাকবাহিনীর অত্যাচার থেকে পিরোজপুর এলাকা রক্ষা করার জন্য ২৮ মার্চ ছেলেদের নিয়ে সশস্ত্র প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছিল। একই সময় পিরোজপুর শহর ও পাশের গ্রামগুলো থেকে মেয়েদের মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য বাছাই করা হচ্ছিল। এই বাছাই প্রক্রিয়া এবং প্রশিক্ষণে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মেজর জিয়াউদ্দিন, তৎকালীন ছাত্র নেতা এম.এ মান্নান, আলী হায়দার খানসহ অনেকে। প্রথম ব্যাচে বাছাইকৃত ২০জনের মধ্যে রওশন আক্তার লিলি ও তার বোন আলো অন্তর্ভুক্ত হন। লিলির মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের

ক্ষেত্রে তাঁর বোন আলোর অনুপ্রেণা জোরালোভাবে কাজ করেছে। ২৯ মার্চ তাদের প্রশিক্ষণ শুরু হয়।

রাজারহাট ওয়াপদা স্কুলের মাঠে তাঁদের এই প্রশিক্ষণ হয়। তাঁদের প্রশিক্ষণ দেন ফজলুর রহমান। তিনি যে-সমস্ত আগ্নেয়াস্ত্রের প্রশিক্ষণ পান তার মধ্যে গ্রেনেড ছোড়া, রাইফেল চালনা ও বিভিন্ন ধরনের বিস্ফোরকদ্রব্য ব্যবহার উল্লেখ্যযোগ্য। আগ্নেয়াস্ত্রের পাশাপাশি নার্সিং প্রশিক্ষণও গ্রহণ করেন তিনি। তাঁদের নার্সিং প্রশিক্ষণ দেন ডাক্তার শ্যামাচরণ ও ডাক্তার মমতাজ। একসাথে আরো যারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন তাদের মধ্যে শিরিন, রোকেয়া বেগম হেনা, বুলি রাণী সাহা অন্যতম। প্রথম ব্যাচে তাঁরা ২০জন মেয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। একমাসব্যাপী তাঁদের প্রশিক্ষণ ও মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি চলে। প্রশিক্ষণ শেষে সংগঠিত হতে থাকে মুক্তিযোদ্ধারা।

রওশন আক্তার লিলি তাঁর পরিবারের সাথে পিরোজপুর শহর থেকে প্রায় ৭ কিলোমিটার দক্ষিণে নামাজপুর গ্রামে আশ্রয় নেয়। আশ্রয়দাতা ছিলেন লিলির বাবার বন্ধু। তার মেয়ে, হোসনে আরা বেগম অঞ্জু ছিলেন লিলির সহযোদ্ধা। যুদ্ধ শুরুর পূর্বে অঞ্জু ও লিলিদের পরিবার পাশাপাশি থাকতেন।

নামাজপুর গ্রামেও নিরাপত্তার অভাবে বেশিদিন থাকতে পারেন নি তিনি। জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে তিনি তাঁর পরিবারের সাথে ফিরে আসেন পিরোজপুরের বাসায়। জুলাই মাসে তিনি তাঁর বোন আলোর সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে কাজ শুরু করেন। এ সময়ে চাল, ডাল, কাপড়-চোপড়, অর্থ সংগ্রহ করে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সরবরাহ করেন। পুলক ও কামাল নামের দুইজন মুক্তিযোদ্ধার মাধ্যমে তিনি তথ্য ও গুরুত্বপূর্ণ খবর আদান-প্রদান করতেন। বিভিন্ন ছদ্মবেশ ধারণ করে তিনি ইনফরমার হিসেবে কাজ করেন। বয়স কম থাকায় কেউ তাঁকে সন্দেহ করত না। তাই গোপনীয় তথ্য, খাদ্য, অর্থসহ বিভিন্ন জিনিসপত্র অস্ত্র গোলাবারুদ সরবরাহ ছিল তার জন্য অত্যন্ত সহজ।

তিনি এবং তাঁর বোন আলোর মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে কাজ করার খবর পাকবাহিনী জানতে পেরে লিলিদের বাসায় হানা দেয়। ওই দিন লিলিদের বাসায় হানা দেওয়ার ঘণ্টাখানেক আগে লিলি আলমকাঠির উদ্দেশে রওনা হন। ভাগ্যক্রমে ওই যাত্রায় বেঁচে যায় লিলি ও তার বোন আলো। এরপর মাঝেমধ্যেই তাঁদের বাড়িতে হানা দিতে থাকে পাকসেনারা। কোনো বাধা বা ভয়কে তোয়াক্কা না করে লিলি ও তাঁর বোন আলো বিভিন্ন বাসায় থেকে, মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে আগের মতো কাজ করতে থাকেন। লিলি ও আলোর কাজে দিনে দিনে পাকসেনা ও রাজাকারেরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তারা নভেম্বর মাসে লিলিদের বাসায় আবার হানা দিয়ে লিলির বড় ভাই নূরুল হুদাকে ধরে নিয়ে যায়। দু'দিন পরে তদানীন্তন মুসলিম লীগ নেতা সুলতান মাহমুদের সহযোগিতায় মুক্তি পায় তাঁর ভাই নূরুল হুদা।

এরপর পিরোজপুরে থাকা মোটেও নিরাপদ নয় ভেবে, তিনি পিরোজপুর শহরের অদূরে রানিপুর গ্রামে তাঁর বাবার এক বন্ধুর বাড়িতে আশ্রয় নেন। রানিপুরে গিয়েও তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে কাজ করেন। দেশ স্বাধীনের পূর্ব পর্যন্ত তিনি মুক্তিযুদ্ধে তাঁর ওপর অর্পিত সকল দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পালন করেন এবং প্রশংসিত হন।

দেশ স্বাধীনের পরে ১৯৭৩ সালে তিনি এস.এস.সি পাশ করেন। তাঁর বিয়ে হয় মহিউদ্দিন দেওয়ানের সাথে ১৯৮২ সালের ৫ নভেম্বর। বর্তমানে দুই ছেলে তাঁর। তাঁরা পড়াশোনা করছে। পারিবারিকভাবে তিনি মোটামুটি সচ্ছল।

মুক্তিযোদ্ধাদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন, 'অমুক্তিযোদ্ধাদের ভিড়ে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধারা হারিয়ে যাচ্ছে। এই সমাজে মুক্তিযোদ্ধাদের সঠিক মূল্যায়ন, স্বীকৃতি ও মর্যাদা নেই । তাদের রাষ্ট্রীয়ভাবে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়া উচিত। আজ ৩২ বছরে কেউ আমাদের খোঁজ নেয় নি। আমি দারিদ্র্য ও রাজাকারমুক্ত একটি অসাম্প্রদায়িক দেশ চাই।'

মোসাম্মৎ ফাতেমা খাতুন
(সখিপুর, টাঙ্গাইল)

১৯৫৬ সালে টাঙ্গাইলের সখিপুরের বয়রাতুল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ফাতেমা। পিতা মরহুম সিরাজ মিয়া ছিলেন দিনমজুর, মাতা লালজান বেওয়া গৃহিণী। ১৯৭১ সালে ফাতেমা খাতুন ছিলেন ১৪ বছরের কিশোরী। গরিব পিতার সংসারে অনেকটা অবহেলা-অযত্নেই বেড়ে ওঠেন তিনি। '৭১-এর চলমান পরিস্থিতির চুলচেরা হিসাব না জানলেও মুক্তিযোদ্ধারা যে দেশের জন্য এবং সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করছেন— এই উপলব্ধি পুরোপুরিই ছিল তরুণী ফাতেমা'র।

১৯৭১ সালে যুদ্ধ শুরু হলে বহেরাতলা বন বিভাগের এক চৌকিদার তাঁকে স্থানীয় ক্যাম্পে নিয়ে যান। তাঁর ইচ্ছাশক্তির অকৃত্রিমতা দেখে কমান্ডার তাঁকে ক্যাম্পে থাকার অনুমতি দেন।

১৪ বছরের ফাতেমা খাতুন যুদ্ধের সময় ন'মাসই বহেরাতলা মুক্তিবাহিনী ক্যাম্পে অবস্থান করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রান্নার কাজ ছাড়াও আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা-শুশ্রূষার কাজগুলো তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে করতেন। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিভিন্ন অবস্থানে খাবার সরবরাহ করতেন। নানা ধরনের ছদ্মবেশ নিয়ে তিনি বহেরাতলা, কুতুবপুরসহ বিভিন্ন ক্যাম্পে গুরুত্বপূর্ণ খবরাখবর আদান-প্রদান করেছেন। তাঁর বয়স কম হওয়াতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তাকে পুরুষের পোশাক পরানো হতো। অস্ত্র রক্ষণাবেক্ষণ, যুদ্ধক্ষেত্রে গোলাবারুদ পৌঁছে দেয়াসহ ক্যাম্পের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে তিনি কমান্ডারের আস্থাভাজন বীরসেনানী হিসেবে বিবেচিত হন। ফাতেমা বেগম বিভিন্ন সময়ে জনাব আঃ কাদের সিদ্দিকী, ব্রিগেডিয়ার ফজলুল হক, হুমায়ুন খানের কমান্ডিংয়ে কাজ করেছেন।

মুক্তিযুদ্ধের একটি বিশেষ ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে অশ্রুসজল হয়ে ওঠেন ফাতেমা। তিনি বলেন, 'কালিহাতি বল্লা এলাকায় একদিন দিনেরবেলায় মুক্তিযোদ্ধারা হানাদার বাহিনীকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। অনেক গোলাগুলি হয়। আমি মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য খাবার নিয়ে যাচ্ছিলাম। আমার মাথার উপর দিয়ে শত শত গুলি

চলে যায়। ঐদিন আমি মুক্তিবাহিনীদের ভাত খাওয়াতে পারি নি। ভাত নিয়ে ক্যাম্পে ফিরে আসি। আজও সে-কথা মনে পড়লে আমার মন খারাপ হয়।'

ফাতেমাকে উদ্দীপ্ত করত সেই বিখ্যাত শ্লোগান—

বাঁশের লাঠি তৈরি করো

অস্ত্র বলে হাতে ধরো।

'শেখ সাবই পাকিস্তানিদের কাছ থেকে দেশটাকে স্বাধীন করেছেন'— এই সত্যটাই প্রকাশিত হলো বঙ্গবন্ধুর কথায় তার চোখের কোণ অশ্রুসিক্ত দেখে।

স্বাধীনতার দুই বছর পরে ফাতেমা খাতুনের বিয়ে হয় শেরপুরের আব্দুস সামাদের সাথে। কালিহাতি পরিবার পরিকল্পনা অফিসে তিনি চাকরি করতেন। বিয়ের বারো বছর পর প্রথম স্বামীর সাথে তাঁর ছাড়াছাড়ি হয়। প্রথম সংসারে তিনটি মেয়ে। ছোট মেয়েকে নিয়ে ফাতেমা খাতুনের একার সংসার শুরু হয়। আবার ৫ বছর পর তিনি বিয়ে করেন একই এলাকার মোবারক আলীকে। স্বামী-স্ত্রী দু'জনই সখিপুর পৌরসভায় অস্থায়ী ঝাড়ুদার হিসেবে কর্মরত আছেন। স্বামী-স্ত্রী মিলে ১৫০০ টাকার সামান্য আয় দিয়ে জীবন প্রবাহিত রেখেছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ছালেহা বেগম।

একটি স্বাধীন দেশ পাওয়ার জন্য, পরাধীনতার হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, দু'বেলা ঠিকমতো খাবার জন্য যুদ্ধ করেছিলেন ফাতেমা বেগম। কিন্তু কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে তার স্বপ্ন? ঝাড়ুদারের ঝাড়ুর আঘাতে ব্যাপ্ত ধূলির মতো ধূলিময় আমাদের স্বদেশ। তাই নতুন প্রজন্মকে তিনি জানাতে চান তাঁদের ত্যাগ যেন মিথ্যা হয়ে না যায়, দেশের মানুষ যাতে মুক্তিযুদ্ধের আসল ইতিহাস জানতে পারে, মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সামান্য সম্মান পেলেই সার্থক হবে ফাতেমা বেগমের মহান ত্যাগের ইতিহাস।

মোসাম্মৎ মেহেরুন্নেছা
(ভোলাহাট)

তিন দিকে ভারতের সীমানা এবং এক দিকে মহানন্দা দ্বারা পরিবেষ্টিত ভৌগোলিক সুবিধার কারণে মুক্তাঞ্চল হিসেবে মুক্তিযোদ্ধাদের একটা কৌশলগত অবস্থান ছিল ভোলাহাট। ভোলাহাট থানার গিলাবাড়ি নামক স্থানে ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং অস্থায়ী হাসপাতাল। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য আসা নারী-পুরুষ প্রশিক্ষণ নিয়েছে এখানে। ভোলাহাটেরই এগারজন নারী এই ক্যাম্প থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ও নার্সিং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং সক্রিয় অবদান রাখেন।

এই বীর প্রসবিনী ভোলাহাটেরই বীর মুক্তিযোদ্ধা মেহেরুন্নেছা। মাতা মোসাম্মৎ আমিনা খাতুন, পিতা মনসুর আলীর অকুতোভয় কন্যা আগস্ট মাসের শেষের দিকে ভোলাহাটের অস্থায়ী হাসপাতালে নার্স হিসেবে নিজেকে নিয়োজিত করেন। নার্সের ট্রেনিংয়ের পাশাপাশি রাইফেল চালনা এবং গ্রেনেড ছোড়ার কৌশল রপ্ত করেন তিনি। ক্যাম্প কমান্ডার হাফিজ উদ্দিন হাসনু ভাইয়ের অধীনে অস্ত্র প্রশিক্ষণ এবং ডাক্তার বকুল, ডা. জসিম এবং ডা. ইয়াসিনের অধীনে নার্সিংয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

আহতদের সেবা-শুশ্রূষা থেকে শুরু করে মাঝে মাঝে ডাক্তারদের সাথে থেকে অপারেশনের কাজেও সহযোগিতা করেছেন মেহেরুন্নেছা।

একাত্তরের কথা মনে হলে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন এই বীর নারী। রোগীদের ক্ষতস্থান পরিষ্কারের সময় এবং ব্যান্ডেজ করার সময় আহতরা কী ভয়ঙ্কর ব্যথায় গোঙাত! অনেকবার কেঁদেছেন এই কষ্ট দেখে। কেউ কেউ প্রচণ্ড ব্যথায় 'জয় বাংলা' চিৎকার দিয়ে উঠত। বত্রিশ বছর পর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে কখনো কখনো তার চোখ দীপ্ত হয়ে ওঠে। একাত্তরে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে যে মনোবল তিনি দেখেছেন তা আর আজকের প্রজন্মের মধ্যে দেখা যায় না। অসুস্থ অবস্থায়ও তারা ছটফট করত দ্রুত সেরে ওঠার জন্য, আবার যুদ্ধে যাবার জন্য প্রত্যয়ী হতো। সে কথা মনে পড়লেই মেহেরুন্নেছার বুক গর্বে ভরে ওঠে।

গোমস্তাপুর থানার রহনপুর যুদ্ধক্ষেত্রে পাকবাহিনীর বাংকারে নির্যাতনের যে চিত্র দেখেছেন মেহেরুন্নেছা তা আজও মনে হলে আঁতকে ওঠেন তিনি।

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পেরে নিজেকে গর্বিত মনে করেন মেহেরুন্নেছা কারণ দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য, মানুষের মুক্তির জন্য কিছু করতে পেরেছেন তিনি।

তবে যে আশা নিয়ে যুদ্ধ করেছেন, শত্রুর রোষানলে নিজেকে সমর্পণ করেছেন তা আজও পূরণ হয় নি বলে মাঝে মাঝে তার মতো শত মানুষের ত্যাগকে বৃথাই মনে হয় তাঁর কাছে। স্বাধীনতাবিরোধীদের আস্ফালন, সাম্পদায়িকতা, দখলদারিত্ব, ইতিহাস বিকৃতি তাঁকে বেদনাহত করে।

একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রকৃত সম্মান নিয়ে বাঁচতে চান তিনি। নতুন প্রজন্মের কাছে একটাই আবেদন— তারা যেন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি থেকে জাতিকে রক্ষা করে।

বুলিরানী সাহা
(পিরোজপুর)

৯ নং সেক্টরের সাব-সেক্টর কমান্ডার মেজর জিয়াউদ্দিন (অব.), মুক্তিযোদ্ধা এমএ মান্নান ও মুক্তিযোদ্ধা জাহানারা বেগম আলোর কাছ থেকে জানতে পাই মুক্তিযোদ্ধা বুলিরানী সাহার কথা। ১২ অক্টোবর ২০০২ তারিখ শনিবার মুক্তিযোদ্ধা এমএ মান্নান ও মুক্তিযোদ্ধা রোকেয়া বেগমের সাথে পৌঁছাই বুলিরানী সাহার বাড়ি। কচা ও বলেশ্বর নদীর সংযোগ খালের উত্তর পাড়ে রাজারহাট মহল্লায় থাকেন তিনি। তাঁকে খুঁজে পেতে খুব সমস্যা হয় নি আমার।

পিরোজপুরের পাইকারি সুপারি বাজার হিসেবে এ প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের নিকট বেশি পরিচিত রাজারহাট এলাকা। প্রজন্মের অনেক ছেলেমেয়েরা জানে না মুক্তিযুদ্ধে রাজারহাটের ভূমিকার কথা। কথা হয় বুলি রানীর সাথে।

বুলিরানী সাহা ১৯৫৩ সালে তদানীন্তন পিরোজপুর মহকুমায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা অমূল্য কুমার সাহা ছিলেন একজন ব্যবসায়ী এবং মা কল্যাণী রানী সাহা গৃহিণী। দুই ভাই ও দুই বোনের মধ্যে তিনি বড়। একাত্তরে বুলি রানী ছিলেন ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী। স্কুলজীবন থেকে তিনি ছাত্র ইউনিয়নের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। পিরোজপুরের প্রায় প্রত্যেকটি রাজনৈতিক সভায় তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ দেন। তাই যুদ্ধের পূর্বেই তিনি রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত সক্রিয় ও সচেতন ছিলেন বলে পাকিস্তানিদের দুঃশাসন ও শোষণের প্রকৃত চিত্র তাঁর চোখে খুবই স্পষ্ট ছিল।

৭ মার্চে রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পর থেকেই পিরোজপুরের সকল স্তরের জনগণের মধ্যে অভূতপূর্ব জাগরণ শুরু হয়। ১০ মার্চ ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীরা বাঁশের লাঠি ও লোহার বল্লম হাতে নিয়ে মাথায় লালটুপি পরে মুক্তি আন্দোলনের প্রস্তুতি হিসেবে মিছিল বের করে। মিছিলে অন্যান্য মেয়েদের সাথে বুলিরানী সাহাও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

মার্চের প্রতিটি দিনে রাজনৈতিকভাবে কোনো না কোনো কর্মসূচি ছিল। ২২ মার্চে বিভিন্ন সংগঠনের কর্মীরা ঘরে বসে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা তৈরি করেন

এবং প্রত্যেক ঘরে ঘরে পৌঁছে দেন। ২৩ মার্চ পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। প্রথম পতাকা উত্তোলন করেন তৎকালীন ছাত্রলীগের সভাপতি ওমর ফারুক। তারপর সারা পিরোজপুর সদরে সকল দোকান, বাড়ি-ঘরে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়।

২৫ মার্চের পরে পিরোজপুরে পাকসেনাদের প্রতিরোধ প্রস্তুতি হিসেবে সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। কার্যত এই প্রতিরোধ প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে পিরোজপুরে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হয়। পাকবাহিনীর অত্যাচার থেকে পিরোজপুর এলাকা রক্ষা করার জন্য ২৮ মার্চ ছেলেদের সশস্ত্র প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছিল। একই সময় পিরোজপুর শহর ও পাশের গ্রামগুলো থেকে ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদেরকে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য বাছাই করা হচ্ছিল। মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য বাছাই এবং প্রশিক্ষণের সার্বিক নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মেজর জিয়াউদ্দিন, মুক্তিযোদ্ধা এমএ মান্নান আলী হায়দার খানসহ অনেকে। প্রথম ব্যাচে বাছাইকৃত ২০জনের মধ্যে বুলিরানী সাহা অন্তর্ভুক্ত হন। ২৯ মার্চ একাত্তরে তাঁদের প্রশিক্ষণ শুরু হয়।

পিরোজপুর ওয়াপদা স্কুলের মাঠে (বর্তমান পানি উন্নয়ন বোর্ড) প্রশিক্ষণের মধ্যে ছিল পিটি, প্যারেড, গ্রেনেড ও রাইফেল চালনা এবং বিভিন্ন বিস্ফোরক দ্রব্যের ব্যবহার। মুক্তিযোদ্ধা ফজলুল হক ও মুক্তিযোদ্ধা সফিউদ্দিন তাঁদের প্রশিক্ষণ দেন। আগ্নেয়াস্ত্রের পাশাপাশি তিনি নার্সিং প্রশিক্ষণও গ্রহণ করেন। নার্সিং প্রশিক্ষণ দেন ডা. শ্যামাচরণ সাহা এবং ডা. মমতাজ উদ্দিন। একমাস তাদের প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতি চলে।

প্রশিক্ষণ শেষে সংগঠিত হতে থাকে মুক্তিযোদ্ধারা। ৪ মে ১৯৭১ পাকসেনারা পিরোজপুরে আসে। পাকবাহিনী হুলারহাট লঞ্চঘাটে নেমেই নির্বিচারে গুলি চালায় এবং বাড়ি-ঘর ও দোকানে আগুন দেয়। ঐদিন পিরোজপুরের এসডিও এবং এসপিও সহ বেশ কয়েকজন বাঙালি কর্মকর্তাকে বলেশ্বর নদীর তীরে হত্যা করে। এই বীভৎস দৃশ্য মানুষকে হতবাক করে দেয়।

মুক্তিযোদ্ধারা মাসব্যাপী পাকসেনাদের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল, পাকসেনাদের ভারী অস্ত্রের কাছে তা টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয় না। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে মুক্তিযোদ্ধারা।

'আমি তখন ইনফর্মার হিসেবে কাজ করি। বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের তথ্য সরবরাহ করা ছিল আমার প্রধান কাজ।' এরপর অনেকটা আনমনা হয়ে তিনি বলেন— এগুলো বলে লাভ কী ? আমরা তো বিচার পাব না! বরং এগুলো বললে আমাদের বাংলাদেশ থেকে চলে যেতে হবে। তাছাড়া কোনো দিন পাকবাহিনী ও রাজাকারদের অত্যাচার, নির্যাতন, হত্যা ও লুটতরাজের বিচার হবে না, আর বলেও বা লাভ কী!'

জুন মাসের মাঝামাঝি থেকে বুলিরানী মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন। বিভিন্নভাবে ইনফরমার হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন তিনি। তার দেয়া

তথ্যের ওপর ভিত্তি করে মুক্তিযোদ্ধারা বেশ কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল। তিনি নিজের সর্বস্ব বাজি রেখে দেশের জন্য কাজ করেছেন।

১৯৭৬ সালে তিনি পিরোজপুর সোহরাওয়ার্দী কলেজ থেকে এইচএসসি এবং ১৯৭৬ সালে এই কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন। বর্তমানে তিনি মোড়েলগঞ্জ থানার বোলপুর হাইস্কুলে শিক্ষকতা করছেন।

একাত্তরের স্মৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে অনেকটা আনমনা হয়ে পড়েন বুলিরানী। অনেকক্ষণ চুপ থাকার পর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে তিনি বলেন, 'এগুলো বলে কী লাভ হবে! অমুক্তিযোদ্ধাদের ভিড়ে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধারা হারিয়ে যাচ্ছে। নিগৃহীত হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধারা।' তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান।

সাফিয়া খাতুন
(ঢাকা)

একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় এ দেশের গ্রামের নারীরা যেমন নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন, তেমনি শহরের ভেতর থেকেও নারীরা গেরিলা যোদ্ধা হিসেবে শত্রুর মোকাবেলা করেছেন। পুরুষদের সাথে তাঁরা কখনো সরাসরি ক্যাম্পে থেকে, কখনো আত্মীয় বা পরিচিতজনের বাসায় থেকে বিভিন্ন ছদ্মবেশ ধারণ করে সশস্ত্রযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। এমন একজন নারী বীরমুক্তিযোদ্ধা সাফিয়া খাতুন।

সাফিয়া খাতুনের জন্ম ১৫ মার্চ ১৯৫৫, ধানমণ্ডি থানার কলাবাগান এলাকায়। তাঁর বাবা আমিরউদ্দিন ঢালি এবং মা জোবেদা খাতুন। আট ভাইবোনের মধ্যে সাফিয়া খাতুন ৬ষ্ঠ। দেশ জাতি, শোষণ, অধিকার, স্বাধিকার বিষয়ে ছবক পেয়েছেন পরিবার এবং শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিদের নিকট থেকে। এছাড়া পারিবারিকভাবে ঢাকায় বসবাস এবং একাত্তরে ছাত্রী থাকার সুবাদে বিভিন্ন সভা-সমাবেশে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিতে পেরেছেন তিনি। এভাবে দিনে দিনে তিনি হয়ে উঠেছেন রাজনীতি সচেতন। মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তাঁর সন্ধান দেন এক সাংবাদিক বন্ধু। ঢাকার মিরপুরে গগনচুম্বি অট্টালিকার কোল ঘেঁসে রয়েছে তাঁর টিনশেডের একটি ছোট ঘর। সেখানে থাকেন একাত্তরের ছদ্মবেশী মুক্তিযোদ্ধা সাফিয়া। মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অংশগ্রহণ বিষয়ে কথা বলছিলাম তাঁর সাথে। উনসত্তরের গণআন্দোলনের সময় থেকে সরাসরি ছাত্রলীগের সাথে জড়িত ছিলেন একাত্তরের ষোড়শী সাফিয়া।

৭ মার্চ থেকে পূর্ববাংলার প্রশাসনিক কাঠামো ভেঙে পড়েছিল। গ্রামের সাথে যাদের সম্পৃক্ততা ছিল, তাঁরা গ্রামে চলে যায় আবার কেউ কেউ আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে আশয় নিতে থাকে। সাফিয়াদের গ্রাম এবং শহরের বাড়ি একটাই। তাই যাওয়ার কোথাও তেমন সুযোগ ছিল না। যদিও তাঁর গ্রামে কিছু আত্মীয়স্বজন থাকতেন, বাড়িঘরের কথা চিন্তা করে সেখানে যাওয়া হলো না তাঁদের। তাই বাধ্য হয়ে ঢাকায় রয়ে গেলেন পরিবারের সাথে।

কলাবাগান, রাজাবাজার, ফার্মগেটসহ ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় ৭ মার্চের পরে যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে তরুণ-তরুণীদের সশস্ত্র প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

কমান্ডার মোস্তফা কামাল ও কমান্ডার সৈয়দ আনোয়ার আলীর সহযোগিতায় তখন আগ্নেয়াস্ত্রের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। উত্তর রাজাবাজার (বর্তমান তেজগাঁও কলেজের পশ্চিম পাশে মরিচা হাউজে), তাঁদের প্রাথমিকভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল। গ্রেনেড, পিস্তল ও বিভিন্ন বিস্ফোরক দ্রব্যের ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন তিনি। সৈয়দ আনোয়ার আলী তাঁদের প্রশিক্ষণ দেন। কমান্ডার মোস্তফা কামাল সাফিয়ার ভাগ্নে হওয়ার সুবাদে পারিবারিকভাবে কোনো বাধা ছাড়াই প্রশিক্ষণের জন্য বাসা থেকে যাওয়া-আসা সাফিয়ার জন্য ছিল সহজ। ২৫ মার্চ কালোরাত্রির পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা। এপ্রিল ও মে মাসে সম্পূর্ণ অগোছালো ছিলেন তাঁরা। জুনের শেষ বা জুলাইয়ের দিকে মুক্তিযোদ্ধারা গোপনে ঢাকায় আসতে শুরু করে। আবার মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগাযোগ শুরু হয় সাফিয়ার। জুলাই মাস থেকে অস্ত্র, গোলাবারুদ ও বিভিন্ন তথ্য আদান-প্রদানের কাজ শুরু করেন সাফিয়া।

বর্বরতার খড়গ থেকে মানুষের মুক্তির জন্য সাফিয়া ছদ্মবেশ ধারণ করে শত্রুপক্ষের নিশানা এঁকেছেন। রেকি করেছেন। আঘাত হেনেছেন শত্রুর বক্ষে। নিজের জীবন বাজি রেখে পালন করেছেন কমান্ডারের নির্দেশ। তাঁর ওপর প্রথম নির্দেশ আসে অত্যন্ত গোপনে কাজী দীন মোহাম্মদের বাড়ির ওপর নজর রাখা এবং সুযোগ বুঝে গ্রেনেড চার্জ করা। কাজী দীন মোহাম্মদ ছিলেন একাত্তরের পাকমিলিটারিদের অন্যতম সহযোগী। সাফিয়া বিভিন্ন সময়ে প্রায় ৬ দিন রেকি করার পরে, কাজী দীন মোহাম্মদের বাড়িতে গ্রেনেড চার্জ করেন। এতে একজন সিপাহি আহত হয়। কাজী দীন মোহাম্মদের বাড়িতে অবস্থানরত রাজাকাররা কোনো কিছু বুঝে উঠতে না পেরে এলোপাতাড়ি গুলি করতে থাকে। বোরকা পরিহিতা কূলবধূ বেশে সাফিয়া পাশের বাড়ির আঁকাবাঁকা, অলিগলির ফাঁক দিয়ে নিজেদের বাড়িতে ঢুকে পড়েন। এই গ্রেনেড নিক্ষেপ ছিল সাফিয়ার প্রথম অপারেশন। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম থেকে, তাঁদের বাড়ির সব সদস্য মুক্তিযুদ্ধের কাজে সক্রিয় ছিল। কাজী দীন মোহাম্মদের বাড়িতে গ্রেনেড চার্জের পরে পাকসেনারা রাজাকারদের সহায়তায় তাঁদের বাড়িতে আগুন দেয় এবং গুলি বর্ষণ করে। ওই সময় সাফিয়ার মা এবং কাকি ব্যতীত আর কেউই বাড়িতে ছিলেন না। সাফিয়ার কাকি ও মাকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে পাকসেনারা। এরপর থেকে পাকসেনারা সাফিয়াদের বাড়ির প্রতি বিশেষ নজর রাখে। পাকসেনাদের প্রচণ্ড প্রতাপের মুখে সাফিয়া তাঁর বাড়ি ছেড়ে আত্মীয়স্বজনের বাসায় থেকে মুক্তিযুদ্ধে দায়িত্ব পালন করেছেন।

আগস্ট মাস থেকে যুদ্ধের কাজে আরো সক্রিয় হয়ে ওঠে অকুতোভয়ী যোদ্ধা সাফিয়া। অস্ত্র গোলাবারুদ সংরক্ষণ এবং গোয়েন্দাবৃত্তিতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। এভাবে স্বাধীনতার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি মুক্তিযুদ্ধের কাজে নিজেকে সক্রিয় রেখে প্রশংসিত হয়েছেন।

তিনি যাদের কমান্ডে কাজ করেছেন তাদের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ আনোয়ার আলী, কমান্ডার মোস্তফা কামাল, কমান্ডার আঃ আজীজ বীরবিক্রম (মৃত), মুক্তিযোদ্ধা বজলুর রহমান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কমান্ডারদের আশীর্বাদে ধন্য সাফিয়া দায়িত্বের প্রতি ছিলেন অবিচল এবং নির্ভীক।

দেশ স্বাধীনের পরে তিনি ১৯৭৩ সালে এইচএসসি পাশ করেন। বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে সরাসরি জড়িত থেকে, সমাজসেবামূলক কাজকে তাঁর জীবনের প্রধান ব্রত হিসেবে নিয়েছেন। সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের যোগ্য মর্যাদা প্রত্যাশী সাফিয়া যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দেখতে চান।

রোজিনা আনছারী
(মঠবাড়িয়া)

'পরাধীনতা যে অভিশাপ' তা কিশোর বয়সেই বুঝতে পারতেন স্কুল ছাত্রী রোজিনা। শিক্ষিত মা-বাবার যোগ্য সন্তান রোজিনা বাল্যকাল থেকে ছিলেন স্বাধীনচেতা এবং ডানপিটে। রোজিনার অগ্রজা রোকেয়া হোসেনের অনুপ্রেরণায় প্রায়ই রাজনৈতিক বিভিন্ন সভা-সমাবেশে যোগ দিতেন তিনি। এভাবে দিনে দিনে পাকিস্তানিদের শাসন-শোষণ, বৈষম্যমূলক অর্থনীতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা হয় স্কুলছাত্রী রোজিনার।

১৯৫৮ সালের ১ ফেব্রুয়ারি রোজিনা আনছারী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম নূর নবী আনছারী এবং মা আছিয়া বেগম। তাঁর বাবা ছিলেন ব্যবসায়ী এবং তাঁর মা ছিলেন চাকুরিজীবী। ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এ চাকুরি করতেন রোজিনার মা।

মুক্তিযুদ্ধের আগে থেকেই স্বায়ত্বশাসন আন্দোলন এবং একাত্তরে মুক্তিসংগ্রামের প্রবণতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন রোজিনা আনছারী। মঠবাড়িয়া থানায় পাকবাহিনী স্থায়ী ঘাঁটি স্থাপন করে একাত্তরের মে মাসের মাঝামাঝি সময়। পাকবাহিনী দিনেরবেলা নিরপরাধ মানুষের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয় এবং রাতে নির্যাতন চালায় নারীদের ওপর। তারা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নির্মমভাবে হত্যা করে। তাদের সহযোগিতা করে স্বাধীনতাবিরোধী জামাত ও মুসলিম লীগ সমর্থকরা। এ সময় দশম শ্রেণীতে পড়তেন রোজিনা। পাকবাহিনীর নির্মম নির্যাতনে প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন রোজিনা। তাঁর অগ্রজা রোকেয়া হোসেনের অনুপ্রেরণা এবং তাঁর প্রবল দেশপ্রেম মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করে তাঁকে। তিনি নিরলস সুযোগ খুঁজতে থাকেন মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য।

নয় নম্বর সেক্টরের আওতায়, মঠবাড়িয়া ও পটুয়াখালি অঞ্চলের সাব-সেক্টর কমান্ডার ছিলেন ক্যাপ্টেন মেহেদী আলী ইমাম। ক্যাপ্টেন মেহেদী আলী ইমামের সেকেন্ড ইন কমান্ড ছিলেন ফিরোজ রব্বানী। ফিরোজ রব্বানীর সাথে পারিবারিকসূত্রে পরিচিত ছিলেন রোজিনা। সেই সুবাদে রোজিনা ফিরোজ রব্বানীর নিকট যান এবং মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। রোজিনার আগ্রহ

দেখে তাঁকে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের অনুমতি দেন কমান্ডার রব্বানী। কমান্ডার ফিরোজের অনুমতি নিয়ে বুকাবুনিয়া ক্যাম্পে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন রোজিনা।

বুকাবুনিয়া ক্যাম্পে রোজিনা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। গ্রেনেড চার্জ, রাইফেল চালানো, রিভলবার চালনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ তিনি দক্ষতার সাথে গ্রহণ করেন। এছাড়া নার্সিং প্রশিক্ষণও গ্রহণ করেন তিনি। তাঁকে প্রশিক্ষণ দেন কমান্ডার জহির শাহ। বিভিন্ন ধরনের এক মাসের প্রশিক্ষণ তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে শেষ করেন।

প্রশিক্ষণ শেষে আগস্ট মাসের মাঝামাঝি থেকে তিনি ইনফর্মার হিসেবে কাজ শুরু করেন। তিনি রেকির কাজ করতেন দক্ষতার সাথে। ইনফর্মার ও রেকির কাজ করতেন তিনি বিভিন্ন ছদ্মবেশ ধারণ করে। মাঝেমধ্যে মুক্তিযোদ্ধারা অপারেশনে গেলে তিনি ক্যাম্প পাহারা দিতেন। মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিশ্বস্ত। রোজিনা অস্ত্রশস্ত্র রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করতেন অত্যন্ত সুচারুরূপে। দক্ষতার সাথে তিনি আহত যোদ্ধাদের সেবা শুশ্রুষার কাজ করতেন। রোজিনার সহযোদ্ধা ছিলেন তাঁর বোন রোকেয়া, মিষ্টি ও হেনা।

১৯৭২ সালে তিনি এসএসসি পাশ করেন মঠবাড়িয়া হাইস্কুল থেকে। ইডেন কলেজ থেকে এইচএসসি পাশ করেন ১৯৭৪ সালে। পরে ১৯৭৫ সালের ১৩ অক্টোবর তিনি বিয়ে করেন মঠবাড়িয়া থানার আমড়াগাছিয়া গ্রামের আবু জাফর হাওলাদারকে।

এক ছেলে ও এক মেয়ের মা রোজিনা। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখাচ্ছেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শে তাঁদের মানুষের মতো মানুষ করতে চান রোজিনা।

আজও রোজিনার চোখে জ্বলজ্বল করছে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি। ইতিহাস বিকৃতির হাত থেকে মুক্তিযুদ্ধকে রক্ষা করার জন্য নতুন প্রজন্মের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান রোজিনা।

ছায়ারানী সরকার
(নাগরপুর, টাঙ্গাইল)

বাবা ত্রৈলোকনাথ সরকার ও মা কালিদাসী সরকারের ৬ সন্তানের একজন ছায়ারানী। ১৯৫৭ সালের ১২ সেপ্টেম্বর শিমুল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

বাবা ত্রৈলোকনাথ সরকার ছিলেন একজন এলোপ্যাথি ডাক্তার। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ছায়ারানীর বাবা এক স্থান থেকে অন্যস্থানে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা করে বেড়াতেন। ছায়ারানী সাথে যেতেন বাবাকে সহযোগিতা করার জন্য। এভাবেই ছায়ারানী প্রত্যক্ষ সংগ্রামে জড়িয়ে পড়েন মাত্র পনের বছর বয়সে।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার মাসখানেক পর কাদের সিদ্দিকীর ব্যবস্থাপনায় ছায়ারানী নার্সিং এবং আত্মরক্ষামূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। অসাধারণ দক্ষতায় তিনি বাবার সাথে ঘুরে ঘুরে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা করেছেন; তাদেরকে সুস্থ করে তুলেছেন। কখনো কালিহাতি, কখনো শালগ্রাম, কখনো ঋষিপুর, তেজপুর, সখিপুর, রতনগঞ্জ, কখনো বা বয়রাতুল ঘাঁটিতে আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসাসেবা দিয়েছেন পরম মায়ের মমতায়। এছাড়া যুদ্ধোত্তর সময়ে মেডিকেল কোর-এ কাজ করেছেন। বেশিরভাগ কাজ করেছেন প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে যেখানে পায়ে হাঁটা পথ ছাড়া কোনো গত্যন্তর ছিল না। মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে ছায়ারানী ঘুরে বেড়িয়েছেন ক্যাম্প থেকে ক্যাম্পে।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে চোখ ভিজে যায় ছায়ারানীর। একদিন মুক্তিযোদ্ধাদের খুঁজতে আসা পাকবাহিনী গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়। সেই আগুনের লেলিহান শিখা মধ্য আকাশে গিয়ে পৌছায়। তার ধোঁয়া আচ্ছন্ন করে দেয় নীল আকাশকে। দিকবিদিক মানুষ ছুটে চলে। গ্রাম থেকে কতগুলো মেয়েদের ধরে নিয়ে যায় বর্বর বাহিনী। সেইসাথে চলে রাজাকার আর আলবদরদের অবাধ লুটপাট। সেই দৃশ্য মনে হলেই ঘৃণায় আর দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠেন সাহসী যোদ্ধা ছায়ারানী।

একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গর্ববোধ করেন ছায়ারানী। ছায়ারানীদের নিরন্তর সেবায় একজন যোদ্ধা সুস্থ হয়েছেন; আবার যুদ্ধ করেছেন। স্বাধীন হয়েছে প্রিয়

স্বদেশ। যুদ্ধের পরেও যুদ্ধ করেছেন তিনি। গ্রামে গ্রামে গিয়ে মহিলাদের বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন, প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। যুদ্ধের কয়েক বছর পর তার বাবা মারা যান। শুরু হয় দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে নতুন সংগ্রাম। মা ও ভাইবোনদের দেখাশুনার দায়িত্ব আসে কাঁধে। যে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সময় মতো বিয়ে করতে পারেন নি ছায়ারানী। ১৯৭১-এ পনের বছরের কিশোরী ১৯৯৫ সালে বিয়ে করে সংসারি হন। বর্তমানে তিনি নাগরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সিনিয়র নার্স হিসেবে কর্মরত। নিঃসন্তান ছায়ারানী সরকার এক পালিত কন্যার জননী।

যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে দেশটি যেন আবার সুখী সমৃদ্ধ হয়। দেশের সকল মানুষ বিশেষ করে মেয়েরা যাতে স্বাধীনভাবে চলতে পারে; মানুষে মানুষে যাতে ঐক্যের বন্ধন রচিত হয়— এরকম একটি স্বপ্ন দেখতেন তিনি। একটি অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের স্বপ্নে বিভোর ছায়ারানী প্রতিনিয়ত স্বপ্নভঙ্গের বাস্তবতায় জর্জরিত হচ্ছেন।

নতুন প্রজন্মের কাছে তার আবেদন— তারা যেন দেশকে ভালোবাসে। দেশের মানুষকে ভালোবাসতে পারে।

রাবেয়া খাতুন
(বরিশাল)

রাবেয়া খাতুন। ১৯৪৩ সালের ১ নভেম্বর আগৈলঝরা থানার গৈলা গ্রামে সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে তার জন্ম। পিতা রজ্জব হোসেন তালুকদার। মা ছুটু বিবি। ছোটবেলা থেকেই দুরন্ত বালিকা রাবেয়া ছিলেন চটপটে ও স্বাধীনচেতা। শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি রাবেয়ার ছিল অগাধ ঝোঁক। চল্লিশের দশকে ধর্মান্ধতার কারণে মেয়েদের স্কুলে পড়াশোনা বেশ কষ্টসাধ্য ছিল— বিশেষ করে মুসলিম মেয়েদের ক্ষেত্রে। ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও রাবেয়া খাতুন স্কুলের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলোতে যোগ দিতেন। নদী বিধৌত বরিশালের পয়মন্ত প্রকৃতি আর মানুষের প্রতি ভালোবাসা তাকে উদাস-উদার আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী করে তুলত। '৫২র ভাষা আন্দোলনের সময় রাবেয়া ছিলেন নিতান্ত কিশোরী। কিন্তু ঐ বয়সেই দুরন্ত রাবেয়া আন্দোলনের বিভিন্ন সভা-সমাবেশে যোগ দিতেন বড়দের সাথে। এই আন্দোলনের সময়ই বিভিন্ন সভায় আব্দুর রব সেরনিয়াবাদ, মহিউদ্দিন আহমেদ এবং বঙ্গবন্ধুর মতো মহান নেতাদের সাথে তাঁর পরিচিতি ঘটে। আর এই সভা-সমিতির মধ্য দিয়েই রাবেয়ার মনে পাকিস্তানি শোষণের বিরুদ্ধে ঘৃণার বীজ রোপিত হয়।

১৯৬০ সালে গৈলা স্কুল থেকে মেট্রিক; ১৯৬২ সালে বরিশাল মহিলা কলেজ থেকে আই.এ এবং ১৯৬৮ সালে বি.এ পাশ করে আগৈলঝরা বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন তিনি। একই সাথে এলাকার মেয়েদের নিয়ে মহিলা সমিতি গঠন করেন। অশিক্ষিত বাচ্চাদের অক্ষরদান, মহিলাদের সেলাই শিক্ষা ছিল এই সমিতির প্রধান কাজ। ১৯৬৯ সালে রাবেয়া বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। বরিশালের চরবাগরা গ্রামের অ্যাডভোকেট আব্দুর রশিদের সাথে।

৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের পরই বরিশালে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বরিশালের প্রতিবাদী নেতাদের নিয়ে গঠিত হয় সংগ্রাম পরিষদ। সংগ্রাম পরিষদের সদর দফতর স্থাপিত হয় বরিশাল গার্লস কলেজে এবং সামরিক ঘাঁটি স্থাপিত হয় বরিশাল মহিলা কলেজে। মূলত এই সময় থেকেই রাবেয়া জড়িয়ে পড়েন মুক্তিসংগ্রামের মহান ব্রতে।

বরিশাল অঞ্চলের সাব সেক্টর কমান্ডার শাহজাহান ওমর ও স্থানীয় কমান্ডার আব্দুল ওহাব খান এবং কমান্ডার মেহেদী সাহেবের কাছ থেকে নির্দেশ পেয়ে ইনফর্মার হিসেবে কাজের মধ্য দিয়েই রাবেয়ার মুক্তিযুদ্ধের কাজ শুরু হয়। বিভিন্ন রকম ছদ্মবেশ ধারণ করে তথ্য সংগ্রহের কাজ করেছেন তিনি। ২৫ এপ্রিল বরিশালের তালতলি যান পাকসেনাদের অবস্থান জানার জন্য। ছদ্মবেশ ধারণ করে দখলদার বাহিনীর অবস্থান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের সময় পাকবাহিনীর অতর্কিত গুলিবর্ষণে আহত হয়ে জ্ঞান হারান তিনি। মুক্তিযুদ্ধে রাবেয়া ও তার স্বামীর সম্পৃক্ততার ব্যাপারে নানান প্রশ্ন করে সন্তোষজনক জবাব না পেয়ে তার স্বামী অ্যাডভোকেট আব্দুর রশিদকে পাকসেনারা গুলি করে এবং মৃত ভেবে চলে যায়। কিন্তু তার স্বামী সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে গেলেও রাবেয়ার একমাত্র নাবালক সন্তান পলাশকে পাকসেনারা নির্মমভাবে হত্যা করে ডোবায় ফেলে দেয়। আজও পলাশের রক্তমাখা শার্ট রাবেয়ার বুকে হাহাকার তোলে। এখনো রাবেয়া শঙ্কিত স্বাধীনতাবিরোধীদের ঔদ্ধত্য দেখে।

মুক্তিযুদ্ধে সন্তান হারানো রাবেয়া গর্ববোধ করেন তাঁর ত্যাগের জন্য। দেশবাসীর নিকট তাঁর আহ্বান তারা যেন মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাসকে নতুন প্রজন্মের কাছে সঠিকভাবে তুলে ধরেন।

তাহেরা বেগম
(লক্ষ্মীপুর)

১৯৫২ সালে লক্ষ্মীপুর জেলার রায়পুর থানার সইছা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তাহেরা বেগম। পিতা নূর মোহাম্মদ পাটোয়ারী, মা আমেনা খাতুন। রানীর মা হিসেবেই এলাকার সকলের নিকট পরিচিত ছিলেন তিনি। চার ভাইবোনের মধ্যে তাহেরা চতুর্থ। ১৪ বছর বয়সেই বিয়ে হয় তাহেরার। স্বামী ছায়েদুল হক ছিলেন তহসিলদার। লক্ষ্মীপুর জেলার হামদাদিয়া ইউনিয়নের হাসন্দি বিজয়নগর ছিল ছায়েদুলের বাড়ি। মূলত শ্বশুরবাড়িতে এসেই মুক্তিযুদ্ধের কথা জানতে পারেন তাহেরা। প্রতিদিন বিভিন্ন এলাকার তরুণ এবং মধ্যবয়সী কিছু লোক এ বাড়িতে এসে বসত। তাহেরা প্রথমদিকে কিছু বুঝতে না পারলেও এটুকু বুঝতে শুরু করেন যে, এঁরা মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে জড়ো হয়েছে। পরে অবশ্য জানতে পারলেন যে, মুক্তিযোদ্ধারা এ বাড়িতে ক্যাম্প করেছে। ধীরে ধীরে মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠেন তাহেরা। মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে তাঁর পরিচিতি ঘটতে থাকে। তাহেরা জানতে পারেন, কেন যুদ্ধ করছে এদেশের মানুষ। কাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিয়েছে বীর যোদ্ধারা। পাকিস্তানিদের অন্যায় শাসনের বিরুদ্ধে তার ক্ষোভ জমতে শুরু করে। সেই ক্ষোভই তাঁকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য অনুপ্রাণিত করে তোলে। প্রথম দিকে নারী হিসেবে নিজেকে দুর্বল ভাবলেও মুক্তিযোদ্ধাদের উৎসাহে তিনি স্বাধীনতাযুদ্ধে সহযোগিতা করার প্রত্যয়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

৩০ বছর আগের ঘটনাগুলোর সাবলীল বর্ণনা দেন তাহেরা বেগম। এপ্রিলের ৯ তারিখে পাক হানাদার বাহিনী প্রথম লক্ষ্মীপুরের বিভিন্ন গ্রামে হানা দেয়। তাহেরাদের বাড়ি ছাড়াও বৈরাগী বাড়ি, ওসমান পাটোয়ারীর বাড়ি, কলিকাপুর রফিক মিয়ার বাড়ি মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প ছিল। এই সকল ক্যাম্পের অধীনেই লক্ষ্মীপুর জেলার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। প্রথম অবস্থায় এসব ক্যাম্পগুলোতে খাবার সরবরাহের কোনো সংগঠিত ব্যবস্থা ছিল না। গ্রামের নারী ও পুরুষদের সংগঠিত করে বাড়ি বাড়ি ঘুরে চাল-ডাল সংগ্রহের কাজ করেছেন তাহেরা।

পরে খাদ্য কমিটি গঠন করে খাদ্য সংগ্রহ ও বিতরণের কাজ শুরু হয়। সংগৃহীত খাদ্য রান্না করে খাওয়ানোর দায়িত্ব পালন করতেন তাহেরা বেগম।

পাকহানাদারেরা ক্যাম্পে হামলা করলে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথেই সরে পড়তেন ক্যাম্প ছেড়ে। আবার ফিরে আসতেন মুক্তিসেনাদের সাথে।

লক্ষ্মীপুর এলাকায় পাকসেনাদের সাথে বহুবার সম্মুখযুদ্ধ হয় মুক্তিবাহিনীর। এগুলোর মধ্যে ৭ জুন ১৯৭১-এর সম্মুখযুদ্ধের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে তাহেরা বেগমের। এই দিন কাজীর দীঘির পাড়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে পাকবাহিনীর সম্মুখ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে তাহেরা বেগম মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে থেকে সরাসরি সহযোগিতা করেন। পাকবাহিনীর অনেক সৈন্য মারা পড়ে এই যুদ্ধে। কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাও শহীদ হন এই যুদ্ধে। ভয়ঙ্কর এই সম্মুখযুদ্ধের কথা মনে হলে এখনো শিউরে ওঠেন তাহেরা বেগম এবং সাথে সাথে গর্বে বুক ভরে ওঠে তাঁর।

দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার পর স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হওয়ায় যুদ্ধের তিন বছর পর তিনটি সন্তান নিয়ে স্বামীর সংসার ছেড়ে বাবার বাড়ি বিজয়নগরে চলে আসেন তাহেরা। কোনো রকমে তিনটি সন্তানকে লালন-পালন করে বড় করে তোলেন। তাহেরার এক ছেলে লক্ষ্মীপুর শহরে রিকশা চালায়, এক ছেলে চায়ের দোকানদার, অন্যছেলে বধির। দিনমজুরি করে জীবন চালাচ্ছে। তাহেরার নিজের কোনো বসত বাড়ি নেই। সরকারি জায়গায় ঘর করে থাকে, ছেলেরা যতটা পারে সাহায্য করে। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বরাদ্দ ভাতাও জোটে নি তাঁর ভাগ্যে। পান নি কোনো সরকারি সাহায্য। তাই বলে কোনো ক্ষোভ প্রকাশিত হলো না তাঁর কণ্ঠে। হয়তো নিজের অভিমানের কথা জানিয়ে করুণা পেতে চান না মুক্তিযোদ্ধা তাহেরা বেগম।

একটি সুখী-সমৃদ্ধ দেশের স্বপ্ন দেখেন তাহেরা বেগম। যে স্বপ্ন নিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হোক। মানুষ যেন খাওয়ার কষ্ট না করে, তাদের সন্তানদেরকে মানুষ করার সুযোগ পায়— এই কথাগুলো বলতে বলতে উদাস তাকিয়ে থাকেন বাড়ির ওপারের মাঠের দিকে। যে মাঠে সবুজ ধানের ক্ষেতে বাতাস দোল দিয়ে যায় নদীর ঢেউয়ের মতো... ।

সখিনা বেগম
(নিকলী, কিশোরগঞ্জ)

কিশোরগঞ্জের নিকলী থানার গুড়ই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন সখিনা বেগম। '৭১-এ নিজের একটি দা দিয়ে ৫জন কুখ্যাত রাজাকারকে হত্যা করে স্বাধীনতার ইতিহাসে এক সাহসী অধ্যায়ের সূচনা করেন কিশোরগঞ্জের এই বীর নারী। তার ডাকনাম খট্‌কী। মা দুঃখী বিবি এবং বাবা সোনাবরের স্বর্ণকন্যা সখিনা বেগম আর্থিক অনটনের মধ্যে বেড়ে উঠলেও খুব অসচ্ছলতা ছিল না তাঁর। ছেলেবেলার দুরন্ত কিশোরী তাঁর চঞ্চলতা দিয়ে মাতিয়ে রাখতেন পুরো গ্রাম।

সখিনার কৈশোর কেটেছে পাকশাসকদের শোষণ আর নির্যাতনের কথা শুনতে শুনতে। তিনি শুনেছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে ঢাকার রাজপথ রঞ্জিত করছেন এ দেশের যুবকেরা। যুবতীরা তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, আগলে রেখেছেন ছায়ার মতো। গ্রামের সরল কিশোরীর মনে ঘৃণার বীজ রোপিত হয় পাকিস্তানি শাসনের বিরুদ্ধে। পাকজান্তাদের বিষদাঁত ভেঙে দেবার অদম্য প্রত্যয়ে যুদ্ধ শুরু হবার প্রায় সাথে সাথেই মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন তিনি। পাকসেনা আর এদেশের দালালদের অত্যাচারে বিপন্ন হয়ে পড়ে সখিনার চিরচেনা জনপদ। প্রত্যয়দীপ্ত সখিনা শরণার্থী হিসেবে আসামে চলে যান এবং মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের চেষ্টা করেন। আসামে সুযোগ না পেয়ে তিনি ফিরে আসেন নিকলীতে। স্থানীয় বসুবাহিনীর অধীনে সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের কাজ শুরু করেন তিনি। প্রথম দিকে ইনফর্মারের দায়িত্ব পালন করেছেন সখিনা। একবার পাকবাহিনীর অবস্থান জানার জন্য এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ছদ্মবেশে সরারচরে যাওয়ার পথে ব্রিজের উপর ধরা পড়েন পাকসেনা ও রাজাকারের হাতে। কিন্তু তাঁকে তো আটক থাকলে চলবে না? কৌশলে সেখান থেকে পালিয়ে এসে সমস্ত তথ্য জানান ক্যাম্পে। সখিনার তথ্য অবলম্বন করে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা হামলা চালায় পাকসেনা ও রাজাকারদের ওপর। আকস্মিক আক্রমণে হতাহত হয় অসংখ্য শত্রুসেনা এবং রাজাকার।

সখিনা বেগমের বীরত্বপূর্ণ অপারেশন ছিল নিকলী স্কুল সংলগ্ন পাকঘাঁটিতে। অক্টোবরের শেষের দিকে ইনফর্মেশন সংগ্রহের জন্য তিনি নিকলী বাজারে যান। সেখানে তিনি শুনতে পান পাকবাহিনীর হাতে তাঁর ভগ্নিপুত্রের মৃত্যুর খবর। প্রতিশোধের আগুন জ্বলে ওঠে সখিনার তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে। দ্রুত ফিরে আসেন ক্যাম্পে। পরদিন ১৯ আগস্ট মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে পাকবাহিনীর ওপর হামলা চালান। হতাহত হয় অসংখ্য পাকসেনা এবং তাদের দোসর দালালেরা। সখিনা বেগম একাই হত্যা করেন ৫ জন রাজাকারকে। কোনো আগ্নেয়াস্ত্র নয়— নিজের দা দিয়ে তিনি প্রতিশোধ নেন বর্বরদের ওপর। সখিনার ব্যবহৃত সেই দাটি সংরক্ষিত আছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে। উল্লেখ্য যে, নিকলী অপারেশনে তাঁর সাহসী ভূমিকার কথা ৫ নং সেক্টরের বড়ছড়া সাব-সেক্টরের কোবরা কোম্পানির সহকারী কোম্পানি কমান্ডার রিয়াজুল ইসলাম খান বাচ্চু (তিনি পরবর্তী সময়ে প্রতিষ্ঠাতা ডেপুটি কমান্ডার, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, নিক্‌লী থানা কমান্ড)। তাঁর স্বাক্ষরিত প্রশংসাপত্রে উল্লেখ করেছেন যে, 'সখিনা বেগম ৫জন পাকসেনাকে হত্যা এবং বিভিন্ন রণাঙ্গনে পুরুষোচিত সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন।' সখিনা বেগমের বীরগাথা নিয়ে কিশোরগঞ্জের দৈনিক 'প্রাত্যহিক চিত্র' পত্রিকায় (১২ নভেম্বর, ১৯৯৭ সংখ্যা) প্রথম বিশদ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

'৭১-এর সুবর্ণ নারী প্রত্যয়ী যোদ্ধা সখিনা এখন কেমন আছেন? কী করে চলছে তার দিন? সম্প্রতি তাঁর সম্পর্কে একটি জাতীয় দৈনিকে (দৈনিক প্রভাত, ৭ আগস্ট '৯৯ সংখ্যা) প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে বিষয়টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃষ্টিগোচর হয় এবং প্রধানমন্ত্রী তাঁকে ৫০,০০০ টাকার অনুদান প্রদান করেন। অসহায় মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে যে মাসিক ৩০০ টাকা ভাতা পেতেন বর্তমানে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। রাজাকার হত্যা করে তিনি বোধহয় কারো বিরাগভাজন হয়েছেন! স্থানীয় সহৃদয় কিছু মহান মানুষের আর্থিক সাহায্যে কোনো রকমে দিন যাপন করছেন মুক্তিযুদ্ধের গর্বিত নারী সখিনা বেগম।

স্বাধীন দেশের কোন ঘটনা সখিনাকে পীড়া দেয়— প্রশ্ন করা হলে দু'চোখে ক্ষোভ আর হতাশার রক্তিম আভা ফুটে ওঠে। যারা সেদিন ধর্ষণ করেছে আমাদের নারীদের; হত্যা করেছে আমাদের মানুষদেরকে, ধরিয়ে দিয়েছে এদেশের সূর্য সেনাদেরকে, লুট করেছে সম্পদ— সেই রাজাকারেরা, আলবদরেরা সদর্পে ঘুরে বেড়ায়; হুমকি দেয়; জামাই আদরে প্রতিষ্ঠা পায় উচ্চপদে; হত্যা করে প্রগতিশীল মানুষদেরকে; পবিত্র সংসদের চেয়ারে বসে অপবিত্র করে জাতির সম্মান— একথা ভাবতেই সখিনার চোখে জল আসে, সেই জল ক্ষোভে পরিণত হয়ে সখিনার নরম চোয়ালকে শক্ত করে তোলে, দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়...।

ছালেহা বেগম
(যশোর)

১৯৫২ সালের ৮ নভেম্বর যশোরের কাজীপাড়ায় পিত্রালয়ে জন্মগ্রহণ করেন ছালেহা বেগম। বাবা মোহাম্মদ আঃ জব্বার ছিলেন পুলিশের ডিএসপি, মা গৃহিণী। আট ভাইবোনের মধ্যে অগ্রজা ছালেহা শৈশব থেকেই বেশ চঞ্চল স্বভাবের ছিলেন। কৈশোরেই বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্বে আলোকিত হয়ে উঠতে থাকেন সালেহা বেগম। লেখাপড়া শুরু করেন যশোরেই। সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠা ছালেহার রাজনীতি সচেতনতা, পাকিস্তানি শোষণ, শাসন, বঞ্চনার মাত্রা-প্রকৃতি সম্পর্কে ছিল সজাগ পর্যবেক্ষণ। সময় আর বাস্তবতার এক অনিবার্য প্রয়োজনেই রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন তিনি।

যশোরের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট ছিল একটু অন্যরকম। যুদ্ধের বেশ পূর্ব থেকেই এখানে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি চলছিল ছালেহার মতো সচেতন মানুষদের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে। কেন্দ্রীয়ভাবে গঠিত নিউক্লিয়াসের আদলে যশোরেও নিউক্লিয়াস গঠন করা হয়। যশোর নিউক্লিয়াসের সক্রিয় সদস্য হিসেবে যোগ্যতার সাথে কাজ করেন ছালেহা বেগম। যশোর নিউক্লিয়াসের একটি গোপন ট্রেনিং ইউনিট গঠন করা হয়। অবসরপ্রাপ্ত সেনা ও বিমানবাহিনীর কর্মকর্তারা এই ইউনিটে প্রশিক্ষণ দিয়ে তরুণ সদস্যদের অস্ত্র চালনা, রেকি পদ্ধতি, ইনফর্মেশন সংগ্রহ, অস্ত্র সরবরাহ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষিত করে তুলতেন। কৌশলগত কারণে বেজপাড়া কবরস্থানের পাশে অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক জনাব রশিদ সাহেবের বাগানবাড়ির দক্ষিণ কোণে ট্রেনিং ইউনিটের কার্যক্রম চলত।

'৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও যখন নির্বাচিত দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হলো না তখন অন্যান্য শহরের মতো যশোরেও আন্দোলন, হরতাল, মিছিল, মিটিং চলছিল দুর্বার উত্তেজনায়। ছালেহা বেগম তখন সতীর্থদের সাথে ট্রেনিং ইউনিটে প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন। এই সময় রবিউল ভাই আ.স.ম. আব্দুর রবের একটি চিঠি নিয়ে আসেন। চিঠির মধ্যে বাংলাদেশের পতাকার

একটি নমুনা দেওয়া হয়। বিস্ময়কর সেই নমুনাটি নিয়ে সালেহাদের বাড়িতেই পতাকাটি তৈরি করা হয়। মার্চের দুই তারিখে যশোর ঈদগাহ্ ময়দানে প্রথম পতাকাটি উত্তোলন করা হয়। মার্চের তিন তারিখে ছাত্রলীগসহ যশোরবাসী পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে আগুনে পুড়িয়ে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। এরপর এক বিশাল মিছিল যখন শহর প্রদক্ষিণ করে টেলিফোন ভবনের দিকে যাচ্ছিল, তখন পাক সামরিক বাহিনী মিছিলের উপর গুলি চালিয়ে চারুবালা নামের এক গৃহবধূকে হত্যা করে। চারুবালা হত্যার পরে পুরো যশোর শহরে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। এইসব ঘটনার সাথে প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ত ছিল ছালেহা বেগম। তিনি শুধু যোদ্ধাই নন, সংগঠনের কাজও তিনি করেছেন সুচারুরূপে।

এপ্রিলের দুই তারিখের পরে ছালেহারা যশোর ছাড়তে বাধ্য হন। তাঁরা ভারতের বিভিন্ন ক্যাম্পে ঘুরে ঘুরে শিক্ষিত মেয়েদের খুঁজে বের করেন এবং সেবিকা ও সশস্ত্র যোদ্ধা হিসেবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। নিজে সরাসরি যুদ্ধ করেছেন যশোর বাব্‌গুিপাড়ায় এবং হাঙ্গরের বিলে। নিউক্লিয়াসের ট্রেনিং ইউনিট থেকেই সালেহা প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন রাইফেল, স্টেনগান এবং এলএমজি চালনায়। বিভিন্ন সময়ে ইনফর্মেশন সংগ্রহ এবং অস্ত্র সরবরাহের কাজও করেছেন তিনি।

এভাবেই প্রথমে সংগঠক এবং পরে সম্মুখযোদ্ধা হিসেবে বীরত্বের অসামান্য স্বাক্ষর রেখেছেন বীর নারী সালেহা। স্বাধীনতার পরে সালেহা বেগমের বিয়ে হয় রবিউলের সঙ্গে।

এই প্রজন্মের প্রতি ছালেহার একটাই বক্তব্য তারা যেন 'মানুষ হয়ে ওঠে, একজন পুরোপুরি মানুষ।' অসাম্প্রদায়িক, শোষণহীন বাংলাদেশ ছালেহার একমাত্র চাওয়া-পাওয়া।

আমেনা জামান
(ঢাকা)

আমেনা জামান। মুক্তিসংগামের সশস্ত্র যোদ্ধা। মা রোকেয়া বেগম এবং বাবা জলিল মিয়ার অগ্নিকন্যা আমেনার জন্ম ধামরাইয়ের ঢালিপাড়া গ্রামে। আমেনার কৈশোর ছিল চপল-চঞ্চল তারুণ্যে ভরপুর। আমেনার কৈশোর কেটেছে পাকজান্তাদের শোষণ, ত্রাসের রাজত্ব এবং এর বিরুদ্ধে বাঙালির প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ডামাডোল দেখে। কিশোরী আমেনা দেখেছেন পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতা আর একই সাথে দেখেছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে চির-বিদ্রোহী বাঙালি তরুণ-তরুণীর আত্মাহুতির অসাধারণ দৃশ্য। '৭১-এর আগে থেকেই আমেনার ক্ষোভ আর ঘৃণা জমতে থাকে পাক শাসকদের বিরুদ্ধে। পুঞ্জিভূত ক্ষোভ আর ঘৃণাই তাকে নিয়ে আসে মুক্তি সংগ্রামের রণাঙ্গনে।

আমেনার স্বামী নুরুজ্জামান ছিলেন সশস্ত্র যোদ্ধা। স্বামীর অনুপ্রেরণা আর ভেতরের তাগিদে আমেনা নেমে পড়েন স্বেচ্ছাসেবিকা হিসেবে। নুরুজ্জামানের বাড়িতে ক্যাম্প গঠিত হয় যুদ্ধ শুরুর অল্পদিনের মধ্যেই। ক্যাম্প কমান্ডার ছিলেন বেনজির আহমেদ। ক্যাম্প প্রধান নুরুজ্জামান।

পাকিস্তানি সেনাদের বর্বরতা এবং তাদের এদেশীয় দোসরদের অত্যাচারে বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতিদিন শত শত শরণার্থী আশ্রয় নিতে আসত ক্যাম্পে। শত শত শরণার্থীর খাবারের ব্যবস্থা করতেন আমেনা বেগম। আমেনা বেগম কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন স্বেচ্ছাসেবিকা হিসেবেও। আহত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়েছেন মায়ের মমতায়। ভালোবাসা দিয়ে সারিয়ে তুলেছেন অসংখ্য আহত বীর সেনানীকে। মানসিক সাহস যুগিয়ে আবার যুদ্ধে পাঠিয়েছেন। এছাড়া যুদ্ধে যোগদানে আগ্রহী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণের জন্য টাকা সংগ্রহ করে ভারতে পাঠানোর মহান দায়িত্বও পালন করেছেন আমেনা বেগম। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিভিন্ন ছদ্মবেশে কখনো গভীর রাতে, কখনো সূর্য ওঠার আগে সহযোদ্ধা নারীদের নিয়ে অস্ত্র পৌঁছে দিতেন ক্যাম্প থেকে ক্যাম্পে। রণাঙ্গন থেকে রণাঙ্গনে। অস্ত্র বন্টন এবং বিতরণের কাজও তিনি করেছেন সুচারুরূপে।

কমান্ডার বেনজির আহমেদ এবং স্বামী নুরুজ্জামানের তত্ত্বাবধানে এলএমজি, রাইফেল ও গ্রেনেড চালনায় দক্ষতার পরিচয় দেন আমেনা। যে হাতে পরম মমতায় শুশ্রূষা দিয়েছেন, সেবা দিয়ে সারিয়ে তুলেছেন যুদ্ধে আহত বীর ছেলেদের— সেই হাতেই উঠে আসে শত্রুধ্বংসী অস্ত্র। ডিসেম্বরের প্রথম দিকে কুশরা, আমশিমুর এবং বেরশ-এ পাকসেনাদের সাথে সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন আমেনা বেগম। তাঁর আঙ্গুল আর চোখের নিপুণতায় রণাঙ্গন কেঁপে ওঠে। এই যুদ্ধে তিনটি স্থানে মোট ১৮ জন পাকসেনা মারা যায়, ৬জন বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। অসংখ্য গোলাবারুদ মুক্তিসেনাদের দখলে আসে। যুদ্ধের শেষের দিকে পাকসেনারা আমেনা জামানের বাড়ি খুঁজে না পেয়ে গ্রামের অন্যান্য বাড়ি নির্বিচারে পুড়িয়ে দেয়। বাড়ির পর বাড়ি লুট করে রাজাকারেরা, ধরে নিয়ে যায় গ্রামের অসংখ্য তরুণীকে।

যুদ্ধের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে রুদ্ধ হয়ে যায় আমেনার কণ্ঠ। পাক হানাদারদের জ্বালিয়ে দেয়া গ্রামের আকাশছোঁয়া লেলিহান শিখার কথা মনে হলে আতঙ্কে শিউরে ওঠেন তিনি। নির্যাতিত নারীর আর্ত চিৎকার আজও শুনতে পান আমেনা জামান।

যে আশায় মৃত্যুকে তুচ্ছ করেছিলেন, যে স্বপ্নে কাঁধে রাইফেল তুলে নিয়েছিলেন অসীম সাহসী আমেনা, তাঁর সে আশা, সে স্বপ্ন পূরণ হয় নি বলে শত শহীদের ত্যাগকে মূল্যহীন মনে হয় মাঝে মাঝে। তবে একথা বিশ্বাস করেন যে, বিপ্লবী বাঙালি আবার জেগে উঠবে একদিন। একাত্তরের বিজয়কে সফল করে তুলবে তাঁরা।

ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠীর ঊর্ধ্বে যে মানুষ, সেই মানুষদের জন্য একটি সফল সমাজ গড়তে অসাম্প্রদায়িক, ধর্মান্ধতামুক্ত বাংলাদেশ গড়ার জন্য আজকের তরুণদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান মুক্তি সংগ্রামের সুবর্ণ নারী আমেনা জামান।
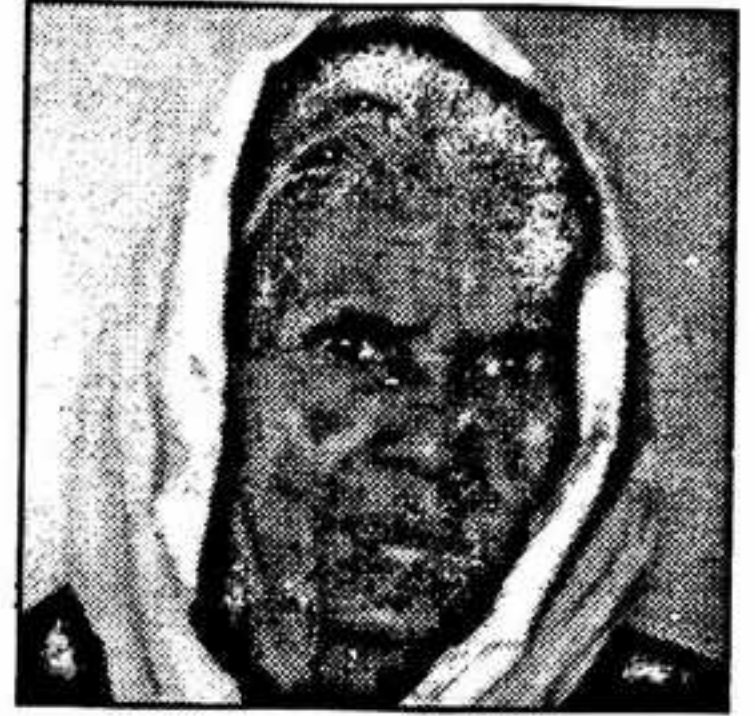
মিরাসি বেগম
(মদন)

একাত্তরের বেশ পূর্বেই মিরাসি বেগমের প্রথম স্বামী চাপু মিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। স্বামী মরার পরে চার ছেলে-মেয়ে নিয়ে দারিদ্র্যের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন তিনি। ক্ষুধার যন্ত্রণায় পৃথিবী গদ্যময়। চার সন্তান নিয়ে ক্ষুধার সাথে মরণপণ যুদ্ধ করছিলেন মিরাসি বেগম। অনেক কষ্টে থানায় রান্না করার একটা কাজ জোগাড় করিয়ে নেন তিনি। মোটামুটি খাওয়া-পরার একটা অবলম্বন পেলেন মিরাসি। থানায় রান্নার কাজের ফাঁকে বাঙালি পুলিশ ভাইদের নিকট থেকে ছবক পেয়েছিলেন শোষণ, নির্যাতন, অধিকার, দেশপ্রেম প্রভৃতি বিষয়ে। অলিখিতভাবে বাঙালি পুলিশভাইদের কাছ থেকে পাওয়া ছবক, একাত্তরে তাঁর মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল।

মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের পূর্বে বাঙালি পুলিশ সদস্যগণ বুঝতে পেরেছিলেন যুদ্ধ সমাগত। ভেতরে ভেতরে পুলিশ সদস্যরা মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে থানার বড়বাবুর (ও.সি) নিকট থেকে রাইফেল ও রিভলবার চালনার প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ভাদ্রমাসের ১৩ তারিখ সকাল সাতটায় মিরাসি খবর পেলেন পাকসেনারা মদন থানার দিকে আসছেন। থানার পাশেই থাকতেন মিরাসি। থানার বড়বাবু ও কয়েকজন বাঙালি পুলিশ বারোটা রাইফেল মিরাসির নিকট রেখে অন্যত্র চলে যায়। ভাদ্রমাসের ১৬ তারিখ বারোটা রাইফেল নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন মিরাসি। তাঁর কমান্ডার ছিলেন একলাস মিঞা, আলম মিঞা এবং গবিন্দশ্রী গ্রামের বাচ্চু মিঞা।

মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করে মিরাসি নতুন করে প্রশিক্ষণ পান স্টেনগান ও গ্রেনেড চালনায়। কমান্ডার বাচ্চু মিঞা খুব অল্প সময়ের মধ্যে মিরাসিকে প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে তোলেন। অকৃত্রিম দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ মিরাসি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে আগ্নেয়াস্ত্র বিষয়ক প্রশিক্ষণ শেষ করেন।

এই ত্যাগী মুক্তিযোদ্ধা নিজের ভিটামাটি, গরু-বাছুর বিক্রি করে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বাজিতপুর, গংগানগর, ফচিকা ও গাইনপাড়া এলাকায় অবস্থানরত মুক্তিযোদ্ধাদের অর্থের যোগান দিয়েছেন। মিরাসি ক্যাম্পে রান্না করে খাওয়ানো ছাড়াও ভিক্ষুক, পাগলিনী ও কূলবধু বেশে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও বিভিন্ন অস্ত্র-গোলা-বারুদ আনা নেয়ার কাজ করেন। ছদ্মবেশ ধারণে তিনি ছিলেন ভীষণ পটু। তিনি এত নিখুঁতভাবে ছদ্মবেশ ধারণ করতেন যে, কাক-পক্ষীটিরও টের পাওয়া কষ্টকর ছিল। মিরাসি সশস্ত্রযুদ্ধে ছিলেন খুবই পারদর্শী। মদন, কান্দাহার, বাজিতপুর ও কাপাসাটিয়ায় সরাসরি সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন তিনি।

তাঁর এবং সহযোদ্ধাদের দক্ষ অস্ত্র চালনা এবং কমান্ডারের নিখুঁত নির্দেশনায় প্রত্যেকটি যুদ্ধে জয়লাভ করেন তাঁরা। একবার এক রাজাকার মিরাসিকে পাকসেনাদের হাতে ধরিয়ে দেয়। পাকসেনারা তাঁর হাত-পা ও চোখ বেঁধে গুলি করার উদ্দেশ্যে নদীর পাড়ে নিয়ে যায়। এ সময় স্থানীয় মাতব্বর চাঁন মিঞা মিরাসিকে পাগল পরিচয় দিয়ে পাকসেনাদের অনেক অনুরোধ করে ছেড়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেন।

ছাড়া পেয়ে মিরাসি আবার মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। তিনি আটপাড়া, কেন্দুয়া, মোহনগঞ্জ, মদন ও ইতনা এলাকায় কমান্ডারের দেয়া দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পালন করেন। একাত্তরের শেষ দিন পর্যন্ত মিরাসি মুক্তিযুদ্ধে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখে দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার একমাস পরে তিনি কমান্ডারের সাথে অস্ত্র জমা দেন।

অকুতোভয় এই যোদ্ধা জন্ম নেন ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬ সালে। ইতনা থানার পায়েবতল গ্রামে। তার বাবা আবছার উদ্দিন ছিলেন কৃষক এবং মা মিরাজী বেগম গৃহিণী। দুই ভাইবোনের মধ্যে তিনি ছিলেন বড়। প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর মিরাসি কেন্দুয়া থানার রামচন্দ্রপুর গ্রামের মাহাতাবউদ্দিনকে বিয়ে করেন। মাহাতাব উদ্দিনের সংসারে আসার পরে তার ছোট মেয়ের জন্ম হয়। বর্তমানে দুই ছেলে ও তিন মেয়ের জননী মুক্তিযোদ্ধা মিরাসি বেগম।

দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে যে নারী দেশের মুক্তির জন্য নিজের ভিটেমাটি পর্যন্ত শেষ করেছিলেন, তিনি আজও সর্বহারা। দিনে দিনে তার স্মরণশক্তি লোপ পেয়েছে। নুয়ে পড়েছে শরীরের প্রতিটি পেশি। দারিদ্র্যের কষাঘাতে জরাগ্রস্থ এই যোদ্ধাকে এখন লোকে বলে অর্ধপাগল। অর্থাভাবে চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত তিনি। ঘরহারা এই যোদ্ধা মাঝে মাঝে থাকেন মদন থানায় তাঁর ভাই-পো'র কাছে। আবার চলে যান বিভিন্ন মাজারে। এখন মাজার, গাছতলা, আর ক্ষুধা— একাত্তরের এই বীর মুক্তিযোদ্ধার নিত্যসঙ্গী।